

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

রচনা

মুহাম্মদ আবদুল মালেক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ড. মোহাম্মদ ইউছুফ
মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ
ইকবাল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শরীফ

সম্পাদনা

ডক্টর মো. আখতারুজ্জামান
মুহাম্মদ তমীমুদ্দীন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৬

পাঠ্যপুস্তক প্রশমনে সমন্বয়ক

জেরেবকা সুলতানা সিপি

মোঃ আনিছুর রহমান

প্রচ্ছদ

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন

আরিফুর রহমান তপু

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার কম্পোজ

কালার গ্রাফিক

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান হুজিযুস্সের চেতনা, শিঙ্গ-সাহিত্য-সংস্কৃতিবেশ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্মদাবোধ জন্মাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমন্সক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতস্ফুর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের বৃদ্ধকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুরে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঞ্জিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

ইসলামের মূল তত্ত্ব ও বিধানসমূহ শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। একবিংশ শতকের এই সূচনালগ্নে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিতে ইসলামের শাশ্বত বিধানসমূহকে জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের মানবতাবাদী জীবনদর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার্থীরা হাতে পরিবার ও সমাজের প্রতি দেশপ্রেমবোধ, সত্যতা, ন্যায়নিষ্ঠা, সহনশীলতা, উদারতা, শ্রমের মর্মদা কর্তব্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ও সাম্যের চেতনায় উজ্জীবিত হয় সেই দিক বিবেচনায় রেখে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাল্যের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বাল্যনীর্তি।

একবিংশ শতকের অসীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়ন ও ট্রাই আউট কার্যক্রমের মাধ্যমে সন্ধানখন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে - যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রস্তুতি প্রণয়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা আত্মরিকতাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের অনাদিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সৃষ্টিপত্র

অধ্যায়ের নাম	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায় আকাইদ (১-২২)	পাঠ ১-জগৎখিল	০২-০৪
	পাঠ ২-তাওহিদ ও নৈতিকতা	০৪-০৬
	পাঠ ৩-কুফর	০৬-০৭
	পাঠ ৪-শিরক	০৭-০৮
	পাঠ ৫-ইমান মুফসসাল	০৯-১১
	পাঠ ৬-আল-আসমাউল হুসনা	১১-১৪
	পাঠ ৭-রিসালাত	১৪-১৫
	পাঠ ৮-ওহি	১৬-১৭
	পাঠ ৯-আখিরাত	১৭-২০
	পাঠ ১০-সালাত	২০-২৫
দ্বিতীয় অধ্যায় ইবাদত (২৩-৪৬)	পাঠ ২-বিকিন্তি প্রকার সালাত	২৫-২৮
	পাঠ ৩-ঈদের সালাত	২৮-৩১
	পাঠ ৪-সালাতুল জামায়া	৩১-৩৩
	পাঠ ৫-সালাতুল তাহাযিহ	৩৩-৩৪
	পাঠ ৬-সালাতুল তাহাজ্জুদ	৩৪-৩৫
	পাঠ ৭-সালাতুল ইশরাফ	৩৫-৩৬
	পাঠ ৮-সাওয	৩৭-৩৮
	পাঠ ৯-সাওরি	৩৮-৪০
	পাঠ ১০-ইতিফাক	৪১-৪২
	পাঠ ১১-সাতমের (রোযার) নৈতিক শিক্ষা	৪২-৪৩
তৃতীয় অধ্যায় কুরআন ও হাদিস শিক্ষা (৪৭-৭৬)	পাঠ ১-কুরআন মাজিদ	৪৩-৪০
	পাঠ ২-তাভ্বিল	৪০-৪১
	পাঠ ৩-মাক্ক	৪১-৪৩
	পাঠ ৪-মদ্যাক্ক	৪৩-৪৫
	পাঠ ৫-মাদিরা কিতাবুন্নাজ	৪৫-৪৬
	পাঠ ৬-সূরা আল-আমিয়াত	৪৬-৪৮
	পাঠ ৭-সূরা আল-কুরাইয	৪৮-৫১
	পাঠ ৮-সূরা আত-তাক্বীম	৫১-৫৩
	পাঠ ৯-সূরা আল-নাহায	৫৩-৫৫
	পাঠ ১০-সূরা আল-ইখলাস	৫৫-৫৭
চতুর্থ অধ্যায় আখলাক (৭৭-৯৬)	পাঠ ১১-মুনাজ্জাতমুলক আদাত	৫৭-৬৯
	পাঠ ১২-হাদিস শরিফ	৬৯-৭১
	পাঠ ১৩-মুনাজ্জাতমুলক তিসটি হাদিস	৭১-৭২
	পাঠ ১৪-নৈতিক ভগ্নাবলি বিশ্বকৃত তিসটি হাদিস	৭২-৭৪
	পাঠ ১-আখলাকে হাদিমাহ	৭৭-৭৮
	পাঠ ২-পারোপকার	৭৮-৭৯
	পাঠ ৩-শালীনতাবোধ	৭৯-৮০
	পাঠ ৪-সুতির সেবা	৮০-৮২
	পাঠ ৫-আমানত	৮২-৮৩
	পাঠ ৬-হাযের মর্যাদা	৮৩-৮৪
পঞ্চম অধ্যায় আদর্শ জীবনচরিত (৯৭-১১১)	পাঠ ৭-ক্ষমা	৮৫-৮৬
	পাঠ ৮-অসদাচরণ	৮৬
	পাঠ ৯-হিস্যা	৮৭
	পাঠ ১০-ক্রোধ	৮৮
	পাঠ ১১-লোভ	৮৯
	পাঠ ১২-ঈর্ষা	৯০
	পাঠ ১৩-পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া	৯১
	পাঠ ১৪-ইতিফাক	৯২
	পাঠ ১৫-খিনতাই	৯৩-৯৪
	পাঠ ১৬-হযরত ইমামুল (আ.)	৯৭-৯৯
	পাঠ ১৭-হযরত ইউসুফ (আ.)	৯৯-১০০
	পাঠ ১৮-হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনদর্শন	১০১-১০৩
	পাঠ ১৯-হযরত উসমান (রা.)	১০৪-১০৫
	পাঠ ২০-হযরত আলি (রা.)	১০৫-১০৬
	পাঠ ২১-হযরত ফাতিমা (রা.)	১০৭-১০৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ (الْعَقَائِدُ)

আকাইদ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো আকিদাহ। আকিদাহ অর্থ বিশ্বাস। আর আকাইদ শব্দের অর্থ বিশ্বাসমালা। ইসলামের সর্বপ্রথম বিষয় হলো আকাইদ। ইসলামের মূল বিষয়গুলোর ওপর মনে প্রাণে বিশ্বাস করাকেই আকাইদ বলা হয়। আকাইদের সবগুলো বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে। অর্থাৎ তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা ইত্যাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করার নাম আকাইদ। যে এসব বিষয়ে বিশ্বাস করে, সে-ই ইসলামের প্রবেশকারী বা মুসলিম।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- তাওহিদের স্বরূপ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কুফরের পরিচয়, কুফল ও পরিণতি বর্ণনা করতে পারব।
- শিরকের পরিচয়, কুফল ও পরিণতি বর্ণনা করতে পারব।
- বাস্তব জীবনে কুফর ও শিরক পরিহার করার উপায়সমূহ বলতে পারব।
- ইমান মুফাস্সাল (ইমানের বিস্তারিত পরিচয়) অর্থসহ শুদ্ধভাবে পড়তে, বলতে এবং এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আত্মাহর কয়েকটি গুণবাচক নাম ও এসবের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আত্মাহর গুণবাচক নাম সম্পর্কিত গুণসমূহ নিজ আচরণে প্রতিফলনের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- রিসালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ওহির পরিচয় ও এর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব এবং সিরাত ও মিজানের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব।
- আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে নৈতিক জীবনযাপনের উপায় বলতে পারব।
- নৈতিক জীবনযাপনে তাওহিদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ - ১

তাওহিদ (التَّوْحِيدُ)

তাওহিদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। মহান আল্লাহকে এক ও অখিতির সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করার নামই হলো তাওহিদ। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনিই আমাদের রক্ষক, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রিজিকদাতা। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য কিছুই নেই। তিনিই একমাত্র মাহুদ। সকল প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। মনে প্রাণে এরূপ বিশ্বাসকেই তাওহিদ বলা হয়।

তাওহিদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আকাইদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো তাওহিদ। তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ ইমান ও ইসলামে প্রবেশ করে। তাওহিদে বা একত্ববাদে বিশ্বাসের পর আকাইদের অন্যান্য বিষয় বিশ্বাস করতে হয়। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানবজাতির হেসারাতের জন্য দুনিয়াতে অনেক নবি-রাসুল আগমন করেছেন। তাঁরা সকলেই তাওহিদের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। তাদের সকলের দাওয়াতের মূল বাণী ছিল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ অর্থাৎ ‘আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই’। এমন কোনো নবি ছিলেন না যিনি তাওহিদের কথা বলেন নি। বরং সকল নবি-রাসুলই তাওহিদের শিক্ষা প্রচার করেছেন। ইসলামের সকল বিধি-বিধান তাওহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাওহিদের পরিস্থিতি কোনো বিধান ইসলামে নেই। সালাত, হাকাত, সাওম, হজ্জ-সকল ইবাদতই এক আল্লাহর জন্য করতে হয়। কোনো কিছু চাইতে হলেও এক আল্লাহর নিকট চাইতে হয়। এটাই ইসলামের শিক্ষা। অতএব ইসলামে তাওহিদের গুরুত্ব অপরিসীম।

তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে সফলতা এনে দেয়। কেননা তাওহিদ মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দান করে। মানুষ আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও গুণাবলি জানতে পারে। দুনিয়ার কাজকর্মের জন্য মানুষকে পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে - এ শিক্ষা তাওহিদের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। এ শিক্ষার দ্বারা মানুষ অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকলে এর ফলে সে আখিরাতে সফলতা লাভ করবে।

দুনিয়ার জীবনেও তাওহিদে বিশ্বাসের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তাওহিদে বিশ্বাসীগণ শুধু আল্লাহ তাআলার সামনে মাথা নত করে। অন্য কারো সামনে সে মাথা নত করে না। পক্ষান্তরে, তাওহিদে বিশ্বাস না করলে মানুষ বিপথগামী হয়ে যায়। সে গাছ-পালা, পশু-পাখি, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির নিকট মাথা নত করে। নানা মূর্তির পূজা করতে থাকে। ফলে মানুষের আত্মমর্যাদা বিনষ্ট হয়। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষের মধ্যে আত্মসম্মান ও আত্মসচেতনতা জাগিয়ে তোলে।

তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস মানুষকে এক জাতিত্ব বোধ এনে দেয়। ফলে মানুষ পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতায় উত্থিত হয়। পক্ষান্তরে, শিরক বা বহু উপাস্যের বিশ্বাস মানুষকে বহুদল ও গোষ্ঠিতে বিভক্ত করে দেয়। এক মানব জাতির বিভাজন পরিণতিতে পারস্পারিক ঘৃণা-সংঘাত ও হানাহানির কারণ হয়। এতে শান্তি ও মানবতা বিপর্যস্ত হয়।

তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে এক আল্লাহ তাআলার প্রতি নির্ভরশীল করে। ফলে বিপদে-আপদে, দুঃখ-কষ্টে মানুষ হতাশ বা নিরাশ হয় না বরং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে পূর্বোদ্যমে কাজ করতে থাকে এবং সাফল্য লাভ করে। এভাবে তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়ার জীবনে সুখ-শান্তি ও সফলতার দুয়ার খুলে দেয়।

কত বিশাল এ বিশ্বজগৎ। আমাদের পৃথিবী এর সামান্য অংশমাত্র। বড় বড় গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা, গ্যালাক্সি এ বিশ্বজগতে বিরাজমান। এগুলোর প্রত্যেকটিই সুশৃঙ্খলভাবে ঘুরছে। কোনোটি এর নির্ধারিত নিয়মের বাইরে যাচ্ছে না।

কে দিলেন এই নিয়ম? আমাদের পৃথিবী কত সুন্দর। এতে রয়েছে বিশাল আকাশ, বিস্কৃত মাঠ, বড় বড় পাহাড়-পর্বত, প্রবহমান নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর। এ সবকিছুই আপনা-আপনি সৃষ্টি হয় নি। কে এসবের সৃষ্টিকর্তা?



প্রাকৃতিক দৃশ্য

ফল খেতে আমরা সবাই ভালোবাসি। আম গাছে আম হয়, জাম গাছে জাম। আমরা কি কখনো কাঁঠাল গাছে আম কিংবা তরমুজ ধরতে দেখেছি? কেউই সেবিনি। কারণ কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ছাড়া আর অন্য কোনো ফল হয় না। আমাদের চারপাশে রয়েছে নানারকম পশু-পাখি। কাক আমাদের অতিপরিচিত পাখি। কাক সবসময় কা কা করেই ডাকে। কাক কোনো দিন কোকিলের মতো ডাকে না। আবার গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল সবাই নিজ নিজ ক্ষরেই ডাকাডাকি করে। আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি কেন এমন হয়? কেন এক পশু আরেক পশুর ক্ষরে ডাকে না? গাছের ফল-ফসল, পশু-পাখির আচার-ব্যবহার-এসব কে নিয়ন্ত্রণ করেন?

বস্তুত আল্লাহ তাআলাই এই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা। মহাজগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা তাঁরই দান। পৃথিবীর সকল কিছুর স্রষ্টাও তিনিই। আর পশু-পাখি, গাছশালাসহ সবকিছুর নিয়ন্ত্রকও তিনি। তিনিই সবকিছু করেন। বরং তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয়। এসব কিছুতে যদি একের বেশি নিয়ন্তা থাকত, তবে নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

لَوْ كَانَ وَفِيَهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتِ ج

অর্থ : 'যদি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে, আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকত, তবে উত্তরোই ধ্বংস হয়ে যেত।' (সূরা অল-আযিয়া, আয়াত ২২)

একটু চিন্তা করলেই আমরা বিষয়টি বুঝতে পারব। যেমন মহাজগতের সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা যদি একাধিক হতেন, তাহলে মহাজগত এত সুশৃঙ্খলভাবে চলত না। একজন স্রষ্টা চাইতেন সূর্য পূর্ব দিকে উঠুক। আরেকজন চাইতেন পশ্চিম দিকে। আবার অন্যজন দক্ষিণ বা উত্তর দিকে সূর্যকে উদিত করতে চাইতেন। ফলে এক চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

এমনভাবে অম পাছে অম না হয়ে কোনো কোনো সময় কাঁঠল, জাম ইত্যাদিও হতে পারত। এতে আমরা বেশ অসুবিধায় পড়তাম। বস্তুত একাধিক শ্রুতী বা নিয়ন্ত্রক থাকলে বিশৃঙ্খলতার সুন্দর সুশৃঙ্খল অবস্থা বিনষ্ট হয়ে যেত। আল-কুরআনের অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْوِلْدَانِ لَوْلَا ذَاكَ لَفَنَّا كُلَّ نَفْسٍ فَتَرَى الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَاظِمًا

অর্থ: 'আর তাঁর (আল্লাহর) সাথে কোনো ইলাহ নেই। যদি তা থাকত, তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত।' (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত ৯১)

এ আয়াতেও তাওহিদ বা একত্ববাদের তাৎপর্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নিচের উদাহরণের মাধ্যমে আমরা তা বুঝতে পারি। একাধিক শ্রুতী থাকলে তারা তাঁদের সৃষ্টিকে নিয়ে আলাদা হয়ে যেতেন। যেমন আগুনের শ্রুতী আগুন নিয়ে পৃথক হয়ে পড়তেন। অতঃপর সমস্ত কিছুকে আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দিয়ে তার নিজ ক্ষমতার প্রকাশ করতেন। তেমনি মহাসাগরের শ্রুতী সারা পৃথিবী তার সৃষ্টি দ্বারা জ্বিয়ে দিতে চাইতেন। এভাবে শ্রুতীগণ নিজ নিজ সৃষ্টি দ্বারা অনের ওপর বিজয়ী হতে চাইতেন। ফলে আমাদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যেত। পৃথিবীর সকল কিছুই ধ্বংস হয়ে যেত।

এসব বর্ণনা এ কথাই প্রমাণ করে যে ইলাহ মাত্র একজনই। আর তিনি হলেন আল্লাহ তাআলা। তিনি সকল কিছুর শ্রুতী, নিয়ন্ত্রক ও পালনকর্তা। তাঁর হুকুম ও নিয়মেই সবকিছু পরিচালিত হয়। কোনো সৃষ্টিই এ নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পারে না। এসব কাজে তিনি একক ও অধিতীয়। আন্তরিকভাবে এতুপ বিশ্বাসের নামই তাওহিদ বা একত্ববাদ।

আমরা তাওহিদের পরিচয় জানব। এতে বিশ্বাস স্থাপন করব। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে প্রকৃত ইমানদার হবে।

(ক) দলীয় কাজ: তাওহিদের তাৎপর্য নিজের বাতায় মুখস্থ লিখবে এবং প্রত্যেকে তার পাশের বন্ধুকে দেখাবে।

(খ) বাড়ির কাজ: তাওহিদে বিশ্বাসের ফলে ব্যক্তির জীবন ও কর্মে কী কী পরিবর্তন আসতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ-২

তাওহিদ ও নৈতিকতা

তাওহিদ অর্থ একত্ববাদ। আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অধিতীয়-এ বিশ্वासকে তাওহিদ বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

অর্থ: '(হে নবি!) বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক ও অধিতীয়।' (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত ০১)

আর নৈতিকতা হলো শ্রেয়নীতির অনুসরণ। অর্থাৎ কথাবার্তা, আচার-আচরণে কোন বিশেষ নীতির অনুসরণ করাকেই নৈতিকতা বলা হয়। তাওহিদ ও নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। তাওহিদের শিক্ষা মানুষকে ইসলামী নৈতিকতার দিকে পরিচালনা করে। যে ব্যক্তি তাওহিদে বিশ্বাসী, সে ইসলামী নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রার্থী। তিনি আমাদের উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের লালন-পালন করেন। পৃথিবীর সমস্ত নিয়ামত তাঁরই দান। তিনি আমাদের বিশদাঙ্গ থেকে রক্ষা করেন। তিনিই একমাত্র উপাস্য। তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আমাদের সৃষ্টি করার মূল কারণ হলো তাঁর ইবাদত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ: 'আমি জিন এবং মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।' (সূরা আয় যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

সুতরাং মানুষের উচিত তাঁর ইবাদত করা, শুকরিয়া আদায় করা। জীবনযাপনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর হুকুম ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। অতএব, তাওহিদে বিশ্বাস আমাদের আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভালো ও নৈতিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহিত করে। এভাবে নৈতিকতা অর্জনে তাওহিদের পুরুষপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তাওহিদের মূল শিক্ষা হলো আল্লাহ তাআলাকে একক সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করা। পাশাপাশি আল্লাহ তাঁর গুণাবলিতেও একক-এ বিশ্বাসও তাওহিদের অন্তর্গত। তাওহিদ আমাদের আল্লাহ তাআলার নানা গুণের পরিচয় দান করে। যেমন- আল্লাহ তাআলা রাহমান, রাহিম, করিম, গাফকার, রায়যাক, ঝালিক, মালিক, রব ইত্যাদি। এ সমস্ত গুণের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলা একক। কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়। তিনি সকল গুণে অতুলনীয়। কোনো মানুষ বা সৃষ্টির পক্ষে তাঁর এসব গুণের পূর্ণ অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। তবে মানুষ নিজ জীবনে এসব গুণের চর্চা করবে। উত্তম চরিত্রবান হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

আল্লাহ তাআলার এসব গুণ নৈতিকতার সর্বোত্তম স্তর। মানুষ যখন এসব গুণাবলি অনুশীলন করে, তখন তার সকল কাজ নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী হয়। তার দ্বারা নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে তাওহিদ মানুষকে আল্লাহ তাআলার গুণাবলি অর্জন করতে উৎসাহিত করে।

অন্যদিকে আল্লাহ তাআলার অন্যতম গুণ হলো শাস্তিদাতা, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। তিনি সবকিছু জানেন, সকল কিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি একমাত্র মালিক ও মহাবিচারক। এসব গুণ মানুষকে নীতি ও আদর্শ মেনে চলতে সাহায্য করে। এগুলোতে বিশ্বাস করলে মানুষ কোনো অন্যায় ও সুনীতি করতে পারে না। কারণ সে জানে, আল্লাহ তাআলা তার সকল কাজ দেখছেন। তিনি এগুলোর হিসাব নেন। অতঃপর মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেবেন। এভাবেও তাওহিদের শিক্ষা মানুষকে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

তাওহিদ মানুষকে আত্মমর্যাদাশীল করে তোলে। তাওহিদে বিশ্বাসীগণ শুমু আল্লাহ তাআলার ইবাদত করেন। আল্লাহ তাআলাকেই ইলাহ বা প্রভু হিসেবে স্বীকার করে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

অর্থ: 'তিনিই আল্লাহ। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৫)

সুতরাং তাওহিদে বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সৃষ্টির নিকট মাথা নত করে না। কারো আনুগত্য করে না। বরং মানুষ হিসেবে নিজ মর্যাদা রক্ষায় সচেতন থাকে। অপরদিকে অবিশ্বাসীরা সকল কিছুর নিকট ভরসা করে, মাথা নত

করে। এটা মানবিক আদর্শের বিপরীত। ফলে দেখা যায় যে মানুষ তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমে মানবিক গুণ ও মর্যাদা লাভ করে। তাওহিদ মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দিয়ে থাকে।

আমরা জানতে পারলাম যে, তাওহিদ ও নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাওহিদ নানাভাবে মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। যুগে যুগে তাওহিদে বিশ্বাসী মানুষগণ ছিলেন নৈতিকতার উত্তম আদর্শ স্বরূপ।

আমরাও তাওহিদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করব। অন্যায়,অত্যাচার ও দুর্নীতি করব না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির অনুশীলন করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর খুশি হবেন। আমাদের জীবন সুন্দর ও শান্তিময় হবে।

দলীল কাজ : “ওধু তাওহিদে অটল বিশ্বাস মানুষকে বলিষ্ঠ ও নৈতিক চরিত্র উপহার দিতে পারে।” শ্রেণিতে বিষয়টি দলগতভাবে আলোচনা করে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপনা করবে।

পাঠ -৩

কুফর (الْكُفْرُ)

কুফর আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, গোপন করা, ঢেকে রাখা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলা ও ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকে কুফর বলে। যে ব্যক্তি কুফরে লিপ্ত হয়, তাকে বলা হয় কাফির (كَافِرٌ)।

কুফর হলো ইমানের বিপরীত। কুফরের নানা দিক রয়েছে। যেমন:

- ক. আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করা।
- খ. ইমানের অন্যান্য মৌলিক বিষয়কেও অস্বীকার করা। যথা:- নবি-রাসুল, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা, পরকাল, তাকদির, পুনরুত্থান, জাহান্নাম-জাহান্নাম ইত্যাদিকে অবিশ্বাস করাও কুফর।
- গ. ইসলামের ফরয ইবাদতগুলোকে অস্বীকার করাও কুফর। যেমন- সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদত গুলো অস্বীকার করা।
- ঘ. হালাল জিনিসকে হারাম মনে করাও কুফর। তেমনি হারাম বস্তুকে হালাল ধারণা করাও কুফরের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- কেউ যদি মস, জ্বা, সুদ, দুধ ইত্যাদিকে হালাল মনে করে, তবে সেও কুফর করে।

কুফরের কুফল ও পরিণতি

কুফরের কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি নৈতিকতা ও মানবিক আদর্শের বিপরীত। কেননা, আল্লাহ তাআলা আমাদের স্রষ্টা। তিনিই আমাদের রিযিকদাতা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। সুতরাং তাঁকে অবিশ্বাস করা কিংবা তাঁর বিধান অস্বীকার করা কোনোরকমেই উচিত নয়। এটি চরম অকৃতজ্ঞতার শামিল। কাফিরদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আখিরতে কাফিরদের স্থান হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

অর্থ : 'যারা কুফরি করে এবং আমার নিদর্শনগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৩৯)

কুফরির শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। অবশ্য কাফির ব্যক্তি যদি পুনরায় ইমান আনে এবং ইসলামের সমস্ত মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে সে এ শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে। সাথে সাথে তাকে অবশ্যই পূর্ববর্তী কুফরি কাজের জন্য আন্তরিকভাবে লজ্জিত হতে হবে এবং ঝাঁটি মনে তাওবা করতে হবে।

অতএব আমরা কুফর ও এর কুফল সম্পর্কে জেনে এ থেকে বেঁচে থাকব। এ জন্য সর্বদা সতর্ক থাকব। আল্লাহ তাআলার নিকট কুফর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করব।

দলীয় কাজ : কুফরের কুফল ও পরিণতি বর্ণনা কর।

পাঠ - ৪

শিরক (الشِّرْكُ)

শিরক শব্দের অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, সমকক্ষ মনে করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে। অপর কোনো কিছুকে আল্লাহ তাআলার সমতুল্য বা সমকক্ষ মনে করাও শিরক।

যে ব্যক্তি শিরক করে, তাকে বলা হয় মুশরিক (مُشْرِكٌ)।

তাওহিদের বিপরীত হলো শিরক। তাওহিদ হলো একত্ববাদ। আল্লাহ তাআলা এক ও অবিভীর্ণ-এরূপ বিশ্বাসকে তাওহিদ বলে। পক্ষান্তরে, শিরক হলো আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা। কিংবা কাউকে আল্লাহর সমশরীয়ের মনে করা। শিরক প্রধানত তিন প্রকার। যথা:

ক. আল্লাহ তাআলার সত্তার সাথে শিরক করা। যেমন- আল্লাহ তাআলার পিতা, পুত্র কিংবা স্ত্রী আছে-এরূপ বিশ্বাস রাখা।

খ. আল্লাহ তাআলার গুণাবলিতে অংশীদার সাব্যস্ত করা। যেমন- সৃষ্টিকর্তা একজন না মেনে একাধিক সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস করা।

গ. আল্লাহ তাআলার ইবাদতে শিরক করা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত না করে অন্য কারো ইবাদত করা। যেমন- অগ্নি ও মূর্তিপূজা করা।

শিরকের কুফল ও পরিণতি

শিরক হলো জঘন্যতম অপরাধ। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝

অর্থ : ‘নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম।’ (সূরা শূকমান, আয়াত ১৩)

শিরকের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তাআলার সাথে অন্যায় আচরণ করে। কেননা আল্লাহ তাআলাই মানুষের একমাত্র স্রষ্টা। সকল ইবাদত ও প্রশংসা লাভের হকদারও তিনিই। শিরকের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু ইবাদত করে। ফলে আল্লাহর সাথে চরম অন্যায় করা হয়।

অন্যদিকে শিরক মানুষের মর্যাদাহানিকর কর্ম ও বটে। কেননা মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা জীব বা আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ তাআলা সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অথচ মুশরিকরা শিরকে লিপ্ত হয়ে অন্য সৃষ্টির কাছে মাথা নত করে। ফলে মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। এ জন্যই কুরআন মাজিদে শিরককে সবচেয়ে বড় যুলুম বলা হয়েছে।

শিরকের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তাআলা শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। তিনি বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ط

অর্থ : ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত অন্য যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।’ (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১৬)

আমরা শিরক ও এর কুফল সম্পর্কে ভালোভাবে জানব এবং সর্বদা এ জঘন্য পুনাহ থেকে বেঁচে থাকব। আমাদের কল্ম-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনদেরকে শিরকের কুফল ও শোচনীয় পরিণতির কথা বলে সতর্ক করব।

দলীল কাজ : কী কী কাজে শিরক হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রদর্শন কর।

বাড়ির কাজ : শিরক পরিহার করার উপায়সমূহ বর্ণনা কর।

পাঠ - ৫

ইমান মুকাসসাল (الْإِيمَانُ الْمُفْصَّلُ)

أَمِنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

(উকারণ: আমানতু বিদ্বাহি ওয়া মালাইকাতিহি, ওয়া কুতুবিহি, ওয়া রুসুলিহি, ওয়ায় ইয়াওমিল আখিরি, ওয়ায় কাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনায়াহি তাআলা ওয়ায় বাসি বা'দাল মাউত।)

অর্থ : আমি ইমান আনলাম-

১. আদ্বাহর প্রতি,
২. তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি,
৩. তাঁর কিতাবগুলোর প্রতি,
৪. তাঁর রাসূলগণের প্রতি,
৫. আখিরাতের প্রতি,
৬. তাকদিরের প্রতি, যার ভালো-মন্দ আদ্বাহ তাআলার নিকট থেকেই হয় এবং
৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য

ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। আর মুকাসসাল অর্থ বিস্তারিত। ইমান মুকাসসাল অর্থ বিস্তারিত বিশ্বাস। বিস্তারিতভাবে ইমানের বিষয়গুলোর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথকভাবে সবকিছু বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরি। উক্ত বাক্যে ইমানের সাতটি বিষয়ের কথা সুস্বচ্ছভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে এ সাতটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো-

১. আদ্বাহর প্রতি বিশ্বাস

ইমানের সর্বপ্রথম বিষয় হলো মহান আদ্বাহর প্রতি বিশ্বাস। পূর্বের শ্রেণিতে আমরা ইমানে মুজমাল সম্পর্কে জেনেছি। সেখানে আদ্বাহ তাআলার প্রতি কিরূপ বিশ্বাস করতে হবে তা বলা হয়েছে। বস্তুত আদ্বাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাসই ইমানের মূল। আমরা আদ্বাহ তাআলার তাওহিদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস করব। তিনি এক ও অখিতীয়। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে একক ও অভুলনীয়। তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউ নেই। তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণ রয়েছে। তিনিই একমাত্র মাবুদ। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ-ই ইবাদতের যোগ্য নয়।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ আদ্বাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা নূরের তৈরি। তাঁরা সর্বদা আদ্বাহ তাআলার যিকির ও তাসবিহ পাঠে রত থাকেন।

তাদের সংখ্যা অশ্লিষ্ট। আত্মাহ তাআলার হুকুম ব্যতীত তারা কোনো কাজই করেন না।

আত্মাহর নির্দেশ পালনই তাঁদের একমাত্র কাজ। ফেরেশতাগণের মধ্যে চারজন রয়েছেন নেতৃস্থানীয়। তারা হলেন: (১) হযরত জিবরাইল (আ.), যিনি আত্মাহর বাণী নবি-রাসুলগণের নিকট পৌছে দিতেন। (২) হযরত মিকাইল (আ.), যিনি আত্মাহর হুকুমে মানুষ ও জীবজন্তুর জীবিকা বন্টন কাজে নিয়োজিত আছেন। (৩) হযরত ইয়রাইল (আ.), যিনি মানুষ ও জিনদের মৃত্যু ঘটানো বা বৃহৎ কবর করার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত আছেন। (৪) হযরত ইসরাফিল (আ.), যিনি শিঙ্গা নিয়ে আত্মাহর নির্দেশের জন্য প্রস্তুত আছেন। আত্মাহর আদেশ পাওয়া মাত্রই শিঙ্গা মুকবর দেবেন। এতে দুনিয়া ও এর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর দ্বিতীয়বার ফুৎকারে আবার সবাই জীবন ফিরে গেয়ে আখিরাতের ময়দানে বিচারের জন্য আত্মাহর সামনে উপস্থিত হবে। অন্য সব ফেরেশতা আত্মাহর নির্দেশ অনুযায়ী হুকুম পালনে রত আছেন।

৩. কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

আত্মাহ তাআলা বহু আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এগুলো সবই আত্মাহর কালাম বা বাণী। তিনি নবি-রাসুলগণের মাধ্যমে এ কিতাবগুলো মানুষের নিকট পৌছিয়েছেন। এসব কিতাব মানবজাতির জন্য আলোম্বরণ। এসবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব হলো আল-কুরআন। এসব কিতাব আত্মাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, এবূশ বিশ্বাস রাখতে হবে।

৪. রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস

মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আত্মাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে আত্মাহ তাআলার পরিচয় দান করেছেন। সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখিয়েছেন। তাঁরা নিজ থেকে এসব করেননি। বরং আত্মাহ তাআলার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েই তাঁরা তাওহিদের বাণী প্রচার করতেন। তাঁদেরকে আত্মাহর প্রেরিত নবি ও রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে।

৫. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ নয়। বরং আখিরাতের জীবনও রয়েছে। আখিরাত হলো পরকাল। মৃত্যুর পরপরই এ জীবনের তত্ত্ব। মানুষ সেখানে দুনিয়ার ভালো কাজের জন্য জান্নাত লাভ করবে এবং মন্দ কাজের জন্য জাহান্নাম পাবে। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসও ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৬. তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস

তাকদিরকে আমরা ভাগ্য বা নিয়তি বলে থাকি। সবকিছুর তাকদিরই আত্মাহর হাতে। আত্মাহ তাআলাই তাকদিরের নিয়ন্ত্রক। তাকদিরের ভালো-মন্দ যাই ঘটুক, সবই আত্মাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। তাকদির একমাত্র আত্মাহ তাআলাই জানেন। সুতরাং আমরা তাকদিরে বিশ্বাস করব এবং ভালো ফল লাভের জন্য চেষ্টা করব।

৭. পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস

মৃত্যু একটি অনিবার্য সত্য। সকল জীবিত প্রাণিকই মরতে হবে। আবার এমন একসময় আসবে, যখন আত্মাহ তাআলা সবকিছু ধ্বংস করে দেবেন। পৃথিবীর কোনো কিছুই সেদিন অবশিষ্ট থাকবে না। কেবল আত্মাহ তাআলাই থাকবেন। এরপর একসময় আত্মাহ তাআলা পুনরায় সবাইকে জীবিত করবেন। মৃত্যুর পর পুনরায় এ জীবিত হওয়ারকেই পুনরুত্থান

বলে। এসময় সবাইকে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে এবং দুনিয়ার সকল কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। সুতরাং পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উপর্যুক্ত সাতটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এর যেকোনো একটির প্রতিও অবিশ্বাস করা যাবে না। এর কোনো একটিকেও অবিশ্বাস করলে মানুষ মু'মিন হতে পারবে না। আমরা ইমান মুফাসসালে বর্ণিত সাতটি বিষয় সম্পর্কে জানব। এগুলোর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করব।

দলীয় কাজ : ইমানের সাতটি মূল বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

বাড়ির কাজ : প্রত্যেকে শিক্ষককে ইমান মুফাসসাল অর্থসহ মুখস্ত ওনাবে।

পাঠ - ৬

আল-আসমাউল হুসনা (الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)

পরিচয়

পরিচয় : আল-আসমা শব্দটি 'ইসম' শব্দের বহুবচন। 'ইসম' শব্দের অর্থ নাম। আর হুসনা শব্দটি, 'হুসনুন' শব্দের বহুবচন। হুসনুন শব্দের অর্থ সুন্দর। আর আল-আসমাউল হুসনার অর্থ সুন্দর নামসমূহ। আত্বাহ তাআলা সকল গুণের অধিকারী। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা, দয়াবান, ক্রমাশীল, শাস্তিদাতা ও পরাক্রমশালী। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদৃষ্টা ও সর্বশক্তিমান। তিনিই মালিক। পরিত্র কুরআনে এসেছে-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ

অর্থ : 'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।' (সূরা আল-সূরা, আয়াত ১১)

আত্বাহ তাআলা অতুলনীয়। তাঁর সত্তা যেমন অনাদি ও অনন্ত, তাঁর গুণাবলিও তেমনি অনাদি ও অনন্ত। আত্বাহ তাআলার এসব গুণ নানা শব্দে নানা উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়। এসব গুণের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। এ নামগুলোকেই একত্রে আল আসমাউল হুসনা বলা হয়। এই পাঠে আমরা আত্বাহ তাআলার কতিপয় গুণবাচক নামের পরিচয় লাভ করব।

প্রভাব

মানবজীবনে আত্বাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহের প্রভাব অপরিণীম। কেননা এসব গুণবাচক নাম মানবজীবনে দুদিক থেকে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রথমতঃ এসব নামের দ্বারা আমরা আত্বাহ তাআলাকে চিনতে পারি। তাঁর ক্ষমতা ও গুণাবলির পরিচয় পাই। যেমন-রাহমান, রাহিম নাম দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে আত্বাহ তাআলা দয়াবান। গাফফর নাম দ্বারা বুঝি যে মহান আত্বাহ হলেন ক্রমাশীল। সুতরাং পাশ করে খেললে আমরা তাঁর নিকট ক্রমা চাই। তিনিই পারেন সমস্ত পুণ্য ক্রমা করতে।

অন্যদিকে তিনিই হলেন জাক্বার (প্রবল), কাহ্বার (মহাশরক্কাত)। এগুলো স্মরণ থাকলে আমরা কোনো পাশ কাজ করতে

পারি না। কেননা আমরা বুঝতে পারি যে পাপ কাজ করলে তিনি আমাদের শাস্তি দেবেন। তাছাড়া আত্মাহ তাআলাই রিযিকদাতা, নিয়ামতদাতা, কবুণাময়। ফলে আমরা তাঁর নিয়ামত উপভোগ করে তাঁর শোকরিয়া আদায় করতে পারি।

দ্বিতীয়ত: আত্মাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহ আমাদেরকেও উত্তম গুণাবলি অর্জনে উৎসাহিত করে।

সুতরাং আমরাও আমাদের জীবনে আত্মাহর গুণে গুণাবিত হওয়ার চেষ্টা করব। যেমন: আত্মাহ পাক দয়ালু, আমরাও সকলের প্রতি দয়ালু করব, তিনি ন্যায়পরায়ণ, আমরাও সকল ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হব। তিনি রিযিকদাতা। আমরাও কুখ্যাতকে অনু দেব। আত্মাহ তাআলা পরম সৈব্বীল। আমরাও বিপদে-আপদে সৈব্বীল করব। এভাবে আত্মাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহ আমাদেরকে উত্তম চরিত্রবান হতে উৎসাহিত করে।

আত্মাহ হায্বান (أَلْفُ هَاضِ)

হায্বান শব্দের অর্থ চিরজীব। যিনি চিরকাল ধরে জীবিত। আত্মাহ হায্বান অর্থ আত্মাহ চিরজীব। তিনি চিরকাল ধরে অচ্ছেদ, থাকবেন। যখন কোনো কিছুই ছিল না, তখনও তিনি ছিলেন। অব্যবহিত কালে যখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, তখনও তিনিই থাকবেন। তাঁর কোনো ক্ষয় নেই, রোগ-শোক, দুঃখ-জরা, তন্দ্রা-নিদ্রা কিছুই নেই। কোনোবৃণ ধ্বংস তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না। তিনি সকল ক্ষয় ও ধ্বংস থেকে মুক্ত। আত্মাহ তাআলা বলেন:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ

অর্থ: 'তিনিই আত্মাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরজীব ও সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৫)

আমরা আত্মাহ, তাআলার এ গুণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। সকল কাজকর্মে আমরা প্রাণবন্ত থাকব। অলসতা, নির্জীবতা পরিহার করব। ভ্রান্তি, শ্রান্তি, তন্দ্রা, নিদ্রা ইত্যাদি যেন আমাদের কাজে কোনো প্রভাব না ফেলে সে চেষ্টা করব। তাহলে আমরা সফলতা লাভ করব।

আত্মাহ কায্বামুন (أَلْفُ قَاضِ)

কায্বামুন শব্দের অর্থ চিরস্থায়ী, চিরবিরাজমান, চিরবিদ্যমান, সবকিছুর ধারক সত্তা। ইসলামি পরিভাষায় সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সত্তা অনাদি ও অনন্তকালব্যাপী বিরাজমান, তিনিই কায্বামুন। অন্য কথায় আপন সত্তার জন্য যিনি কারো দুখাপেক্ষী নন অথচ সকল সত্তার ধারক, এবূণ সত্তাকে কায্বামুন বলা হয়। আত্মাহ কায্বামুন অর্থ আত্মাহ চিরস্থায়ী। তিনিই সবকিছুর ধারক। তিনি বিশ্ববিধাতা। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। আসমান-জমিনের সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।

আত্মাহ তাআলা চিরবিরাজমান। তিনি সবসময় বিদ্যমান। তিনি অনাদি-অনন্ত। তিনি সবকিছু জানেন। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।

তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং নিশুণভাবে পরিচালনা করেন। কিয়ামত পর্যন্ত সবকিছুর রক্ষক তিনিই। আখিরাতও তিনিই একমাত্র নিয়ন্ত্রক। তিনি ব্যতীত আর কোনো চিরবিরাজমান সত্তা নেই।

আত্মাহ আয্বিন (أَلْفُ عَاضِ)

আয্বিন শব্দের অর্থ মহাপরাক্রমশালী। আত্মাহ তাআলাই সকল ক্ষমতার উৎস ও মালিক। তাঁর ক্ষমতা অসীম। তাঁর

ক্ষমতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। কেউ তাঁর ক্ষমতার মোকাবিলা করতে পারে না। আল কুরআনে এসেছে-

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

অর্থ : 'আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, দত্তদানকারী।' (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৪)

আল্লাহ তাআলা অসীম ক্ষমতাব্যবহী। কেউ তাঁকে অস্বীকার করতে পারে না। তাঁর সাথে যেকোনো প্রত্যাহার করতে পারে না। কেউ তাঁর কৌশল বা পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে পারে না। তিনি যা চান তা-ই হয়। তার কুদরত বা ক্ষমতার মোকাবিলা করার শক্তি কারো নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা অশ্রুমানিত ও লাঞ্ছিত করতে পারেন। দুনিয়ার বড় বড় ক্ষমতাবানদের তিনি ক্ষুদ্র প্রাণি বা বস্তু দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। যেমন তিনি ফেরাউনকে পানি দ্বারা, নমরুদকে মশা দ্বারা, আবরাহাকে ছোট ছোট পাখি দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাঁকে অস্বীকারকারী কেউই তাঁর আঘাত বা শাস্তি থেকে বাচতে পারেনি। ভবিষ্যতেও পারবে না।

আমরা সদাসর্বদা আল্লাহ তাআলার এসব গুণের কথা মনে রাখব, এ গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করব। তাহলে সৎকাজ করা আমাদের জন্য সহজতর হবে।

আল্লাহ খাবিবুন (اللَّهُ خَبِيرٌ)

খাবিবুন অর্থ সম্যক অবহিত। আল্লাহ খাবিবুন অর্থ আল্লাহ তাআলা সবকিছু সম্যক অবহিত, সবকিছু জানেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

অর্থ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন, সকল খবর রাখেন।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)

আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন। তিনি সকল বিষয়েই সম্যক অবহিত। কোনো কিছুই তাঁর নিকট অজানা নয়। আমরা যা বলি বা করি সবই তিনি জানেন। এমনকি আমরা যেসব বিষয়ের কল্পনা করি, তাও তাঁর অজানা নয়। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বস্তু বা প্রাণির খবরও তিনি জানেন। পৃথিবী সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণির খবরও তাঁর জানা। অশ্বকর রাত্রে কালো পাথরের গুপের কালো পিপীলিকার চলাফেরাও তাঁর অজানা নয়। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার মতো খালি চোখে যেসব প্রাণি দেখা যায় না, সে সম্বন্ধেও তিনি সম্যক অবহিত। এককথায় আসমান-জমিন ও এ বিশুব্জগতের এমন কোনো জিনিস নেই যা তাঁর জ্ঞানের বাইরে। তিনি সবকিছু জানেন।

আমরা আল্লাহ তাআলার এ গুণের তাৎপর্য উপলব্ধি করব। সবসময় মনে রাখব যে তিনি আমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে জানেন। আমাদের সব পাপ-পুণ্য কিছুই তাঁর অজানা নয়। আমরা অন্যায় থেকে বিরত থাকব এবং তাঁর ভালোবাসা অর্জন করব।

আল্লাহ সাব্বুন (اللَّهُ صَبُورٌ)

সাব্বুন শব্দের অর্থ মহাধৈর্যশীল। আল্লাহ সাব্বুন অর্থ আল্লাহ মহাধৈর্যশীল। আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় ধৈর্যশীল। তাঁর ধৈর্যের কোনো সীমা নেই।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে নানা নিয়ামত দান করেছেন। তিনিই মানুষকে রিযিক দেন, লালন-

পালন করেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণার খাদ্য-পানীয় দেন। ভয়-ভীতিতে নিরাপত্তা দান করেন। আলো, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, পানি সবকিছু তাঁরই দান। সুন্দর এ পৃথিবীর সবকিছুই তিনি মানুষের কল্যাণে দান করেছেন। এতকিছুর পরও অনেক মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করে না। তাঁর অবাধ্য হয়। তাঁর ইবাদত ছেড়ে দেয়। আত্মাহ তাআলা এসব ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করেন। তিনি মানুষকে নিয়ামত দান বশ্ব করে দেন না। অবাধ্য হলে তিনি যদি আলো বা পানি বশ্ব করে দিতেন, তাহলে সকলে ধ্বংস হয়ে যেত। অবাধ্যতার জন্য তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তিও দেন না। বরং তিনি সুযোগ দেন। মানুষ যদি তাওবা করে ফিরে আসে, তবে তিনি ক্ষমা করে দেন। এরপর যদি মানুষ আবার পাপ করে তিনি পুনরায় ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করেন। বান্দা যদি আবার তাওবা করে তিনি পুনরায় ক্ষমা করেন। আত্মাহ ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। তিনি সর্বদা ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। আত্মাহ বলেন—

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

অর্থ : 'নিচয়ই আত্মাহ ধৈর্যশীলগণের সাথে রয়েছেন।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫৩)

ধৈর্যশীলদেরকে আত্মাহ জন্মাত দান করবেন। মহান আত্মাহ বলেন—

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝

অর্থ : 'তুমি শূভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫৫)

আমরাও আত্মাহ তাআলার এ গুণের অনুশীলন করব। অধীনদেরকে ক্ষমা করব। বিপদে-আপদে নিরাশ হব না, বরং ধৈর্যধারণ করব।

দলীয় কাজ : মানব জীবনে আত্মাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহের প্রভাব বর্ণনা কর।
বাড়ির কাজ : আত্মাহর তাআলার পাঁচটি গুণবাচক নাম অর্থসহ লিখ।

পাঠ - ৭

الرِّسَالَةُ (রিসালাত)

রিসালাত অর্থ বার্তা, সংবাদবহন, চিঠি, খবর পৌছানো ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় আত্মাহ তাআলার বাণী ও পরিচয় মানুষের নিকট পৌছানোর দায়িত্বকে রিসালাত বলে।

আত্মাহ তাআলা মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই একমাত্র রিযিকদাতা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা। কিন্তু মানুষ নিজে থেকে আত্মাহ তাআলার পরিচয় লাভ করতে পারে না। বৃশ্চি-বিবেক ঝাটিয়ে মানুষ বুঝতে পারে যে এ মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন। কিন্তু তিনি কেমন, তাঁর গুণাবলি কিব্ব, তাঁর ক্ষমতা কত-এসব কিছুই মানুষ নিজে নিজে জানতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন পথপ্রদর্শকের। আত্মাহ তাআলা নিজেই মানুষের মধ্য থেকে এসব পথপ্রদর্শক নিয়োগ করেছেন। তাঁরা মানুষের নিকট আত্মাহ তাআলার সঠিক পরিচয় তুলে ধরার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা তাওহিদ ও অবিরাত সম্পর্কে মানুষকে ধারণা দিয়েছেন। আত্মাহ তাআলার বাণী ও আদেশ-নিষেধ মানুষের নিকট পৌছে দেন। এসব দায়িত্বকেই এক কথায়

রিসালাত বলা হয়। যারা এসব দায়িত্ব পালন করেন, তাঁরা হলেন নবি কিংবা রাসুল। সংলগ্ন প্রদর্শনের জন্য মহান আত্মাহ সকল জাতির নিকট নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। আত্মাহ তাআলা বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

অর্থ : 'এবং আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি।' (সূরা আন-নাহল, আয়াত ৩৬)

নবি-রাসুলগণ আত্মাহ তাআলার মনোনীত বান্দা। তাঁরা পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁরা সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

রিসালাতে বিশ্বাস করা ইমানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাওহিদে বিশ্বাস করার সাথে সাথে আমাদের রিসালাতেও বিশ্বাস করতে হবে। কেননা রিসালাতে বিশ্বাস না করলে মুমিন হওয়া যায় না।

নবি-রাসুলগণ রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা ছিলেন আত্মাহ তাআলা ও মানবজাতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী। তাঁদের মাধ্যমেই আমরা আত্মাহ তাআলার সঠিক পরিচয় পাই। তাঁরাই আমাদের নিকট মহান আত্মাহর বাণী নিয়ে এসেছেন। আত্মাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। সুতরাং রিসালাত ও নবি-রাসুলগণের গুণের বিশ্বাস করা অপরিহার্য। তাঁদেরকে অস্বীকার করলে ইমানের সকল বিষয়ই অস্বীকার করা হয়। যেমন- তোমার কোনো বন্ধু কারো মাধ্যমে তোমার নিকট কোনো সংবাদ প্রেরণ করল। এক্ষেত্রে সংবাদ বাহকের প্রতি সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তাহলেই কেবল বাহকের অনীত সংবাদ বিশ্বাস করা যাবে। কেননা সংবাদ বাহককে বিশ্বাস করা না গেলে তার অনীত সংবাদও বিশ্বাস করা যায় না। এতে নানা সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ফলে তোমার বন্ধুর উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না।

তদুপ নবি-রাসুলগণ হলেন সংবাদ বাহকের ন্যায়। তাঁরা আত্মাহ তাআলার বাণী মানুষের নিকট পৌছে দিয়েছেন। যদি আমরা তাঁদের অস্বীকার বা অবিশ্বাস করি, তাহলে তাঁদের অনীত কিতাব ও বর্ণনার মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হবে। আত্মাহ তাআলা, আখিরাত, কিয়ামত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবিশ্বাস জন্ম নেবে। সুতরাং সর্বপ্রথম তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আত্মাহ তাআলাই তাঁদেরকে সংবাদ বহনের জন্য মনোনীত করেছেন - এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে। তবেই আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ইমানের সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করতে পারব। সুতরাং বুঝা গেল, রিসালাতে বিশ্বাস করার গুরুত্ব অপরিহার্য। আমরা সকল নবি-রাসুলের প্রতি বিশ্বাস করব। কাউকে অবিশ্বাস করব না। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

لَا تَقْرَأُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِنْهُمْ سُلَيْمًا

অর্থ : 'আমরা তাঁর রাসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।' (সূরা আল-বাকার, আয়াত ২৮৫)

অর্থাৎ আমরা সকলের প্রতিই বিশ্বাস করি। কারো প্রতি অবিশ্বাস করি না। নবি-রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস করা ফরয। তাঁদেরকে অবিশ্বাস করলে ইমানদার হওয়া যায় না। বরং আমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা নবি-রাসুলগণের কথায় বিশ্বাস না করে আত্মাহর গণ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব আমরা সমস্ত নবি-রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করে চলব।

দলীল কাজ : রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা কর।

পাঠ - ৮

ওহি (الْوَحْيُ)

ওহি (وَحْيٌ) আরবি শব্দ। এর অর্থ ইশারা, ইঙ্গিত, গোপন কথা ইত্যাদি। সাধারণত কোনো ব্যক্তির নিকট গোপনে প্রেরিত সংবাদকে ওহি বলা হয়।

ইসলামি পরিভাষায়, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবি-রাসুলগণের নিকট প্রেরিত সংবাদ বা বাণীকে ওহি বলা হয়। যেমন- আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর আল-কুরআন নাখিল করেছেন। সুতরাং আল-কুরআন হলো ওহি।

ওহি অবতরণ

আল্লাহ তাআলা নানাভাবে নবি-রাসুলগণের নিকট ওহি প্রেরণ করতেন। তন্মধ্যে দুটি পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ।

ক. ফেরেশতার মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণী ফেরেশতার মাধ্যমে নবি-রাসুলগণের নিকট পৌছাতেন। যেমন- হযরত জিবরাইল (আ.) হলেন প্রধান ওহিবাহক ফেরেশতা। তিনি নবি-রাসুলগণের নিকট আল্লাহ তাআলার বাণী নিয়ে হাজির হতেন।

খ. সরাসরি কথা বলার মাধ্যমে। অনেক সময় আল্লাহ তাআলা সরাসরি নবি-রাসুলগণের সাথে কথা বলতেন। যেমন- আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে তুর গহাড়ে কথা বলেছেন। আমাদের প্রিয় নবি (স.) ও মিরাজের রজনীতে আল্লাহ তাআলার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।

প্রকারভেদ : ওহি প্রধানত দুই প্রকার। যথা-

ক. ওহি মাতলু : অর্থাৎ যে ওহি তিলাওয়াত করা হয়। যেমন- কুরআন মাজিদ। কুরআন মাজিদ সালাতে তিলাওয়াত করা হয় বলে একে ওহি মাতলু বলা হয়।

খ. ওহি গায়ের মাতলু : অর্থাৎ যে ওহি তিলাওয়াত করা হয় না। যেমন- হাদিস শরিফ। হাদিস শরিফ সালাতে তিলাওয়াত করা হয় না। এ জন্য একে ওহি গায়ের মাতলু বলে।

মহানবি (স.)-এর বাণী, কাজ ও অনুমোদনকে হাদিস বলে। হাদিসও ওহির অন্তর্ভুক্ত। কেননা মহানবি (স.) নিজ থেকে কিছু বলতেন না বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আনিত হয়েই তিনি কথা বলতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

[অর্থ : 'আর তিনি (হযরত মুহাম্মদ স.) মনগড়া কোনো কিছু বলেন না। বরং এটা তো ওহি, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।']
(সূরা আন-নাযম, আয়াত ৩-৪)

গুরুত্ব

ওহি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওহি সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিল হয়। এটা হলো অকাটা জ্ঞান। এতে কোনোদুশ ভুলত্রুটি নেই। ওহির সংবাদ সকল প্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে। ওহি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। ওহির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সকল প্রকার জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতরিত বলে এ জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ ও অভুলনীয়। আমরা নিজেদের গৃহ সম্পর্কে ভালোভাবে জানি। আমাদের গৃহে কোথায় কোন জিনিস রাখা আছে তা আমরাই সবচেয়ে ভালো বলতে পারব। বাইরের কেউ তা পারবে না। তদ্রূপ আমরাও অন্যের ঘরে কোথায় কী আছে তা বলতে পারব না। তেমনিভাবে আল্লাহ সারা বিশৃঙ্খলতার স্রষ্টা। তিনি নিজ কুদরতে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁর হুকুমেই সকল কিছু পরিচালিত হয়। পৃথিবীর কোথায় কোন জিনিস কী অবস্থায় আছে তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। প্রত্যেক জিনিসের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি অবহিত। সুতরাং তিনি যে সংবাদ-জ্ঞান নাযিল করেন তা অকাটা। কেউ এরূপ জ্ঞান বঞ্জন করতে পারে না।

আল-কুরআন ও হাদিস ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত। এগুলোর মাধ্যমেই আমরা ইসলামের সকল বিধি-বিধান জানতে পারি। তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির জ্ঞানও আমরা এগুলো থেকেই লাভ করি। এগুলো না থাকলে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। সুতরাং ওহির গুরুত্ব অপরিমীয়। ওহির ওপর বিশৃঙ্খল স্বাধীন করলে মানুষের ইমান পূর্ণাঙ্গ হয়।

দলীয় কাজ : প্রেমির সব শিকারী দুই দলে ভাগ হয়ে একদল ওহির অর্থ ও প্রকার সম্পর্কে মুখস্থ করবে এবং অন্যদল ওহির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবে। আবার প্রথম দল গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবে, দ্বিতীয় দল ওহির অর্থ ও প্রকার সম্পর্কে মুখস্থ করবে।

পাঠ - ৯

আখিরাত (الْآخِرَةُ)

আখিরাত অর্থ পরকাল। পরকাল হলো ইহকালের বা দুনিয়ার জীবনের পরের জীবন। দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ জীবন নয়। বরং মানুষের জন্য আর একটি জীবন রয়েছে। সে জীবনই পরকালীন জীবন। পরকালীন জীবন অনন্ত। এ জীবনের তত্ত্ব আছে কিন্তু শেষ নেই। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন-

إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۚ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

অর্থ: 'এ দুনিয়ার জীবনতো অস্থায়ী উপভোগের বস্তুমাত্র। আর নিত্যসন্দেহে আখিরাতই হলো চিরস্থায়ী আবাস।' (সূরা আল মুমিন, আয়াত ৩৯)

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

আখিরাতে বিশ্বাস ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আখিরাতে বিশ্বাস করা অপরিহার্য। আখিরাত অবিশ্বাস করলে মানুষ

ইমানদার হতে পারে না। আদ্বাহ তাআলা মুমিনদের গুণাবলি সন্মার্কে বলেন-

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝

অর্থ : 'আর তাঁরা (মুজাকিগণ) আখিরাতের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে।' (সূরা আল-বাক্বার, আয়াত ৪)

আখিরাত হলো পরকাল। কবর, হাশর, মিয়ান, সিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি আখিরাতের একেকটি পর্যায়। এ সবকটি বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে ইমান আনতে হবে। কোনোটিই অবিশ্বাস করা যাবে না। বলা হয়ে থাকে,

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْآخِرَةِ

অর্থ : 'দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।'

অর্থঃ দুনিয়া হলো আমল করার স্থান। আখিরাত হলো ফলভোগের স্থান। সেখানে মানুষ কোনো আমল করতে পারবে না। বরং দুনিয়াতে মানুষ যেসব আমল করেছে সেসব ফল ভোগ করবে। কৃষক শস্যক্ষেত্রে যেসব চাষাবাদ করে, সেসবই ফল লাভ করে। জমিতে খন লাগালে ফসল হিসেবে খনই পাওয়া যায়। আর কেউ যদি জমিতে কাঁটাগাছ রোপণ করে তবে সে শুধু কাঁটাই লাভ করে। দুনিয়ার জীবনও তদ্রূপ। আর দুনিয়াতে যে ব্যক্তি ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে সে আখিরাতে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে। তাঁর আবাসস্থল হবে চিরশান্তির স্থান জান্নাত। অন্যদিকে যে ব্যক্তি ইমান আনবে না এবং অন্যায় ও খারাপ কাজ করবে, আখিরাতে সে শাস্তি ভোগ করবে। তার ঠিকানা হবে শাস্তি ভোগের স্থান জাহান্নাম। সে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল পুড়বে। আখিরাতে কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করবে না। বরং চিরকাল ধরে শাস্তি অথবা শান্তি ভোগ করবে।

আখিরাতে বিশ্বাস করলে মানবজীবন সুন্দর হয়। মানুষ উত্তম চরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সব ধরনের খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। এ বিশ্বাসের ফলে মানুষ কোনোরূপ অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, অশ্লীল কাজকর্ম করতে পারে না। বরং সে সর্বদা উত্তম ও নেক কাজে অগ্রাহী হয়। আখিরাতে শান্তির আশায় মানুষ দুনিয়াতে ভালো গুণাবলির অনুশীলন করে। ফলে মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতএব, আমরা আখিরাতের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করব। আখিরাতে শান্তি ও সফলতা লাভের জন্য দুনিয়ায় নেক আমল করব। আমাদের দুনিয়ার জীবন শাস্তিময় হবে। আর পরকালে আমরা জান্নাত লাভ করব।

السِّرَاطُ

সিরাত শব্দের অর্থ পথ, রাস্তা, পুল, পন্থতি ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় সিরাত হলো জাহান্নামের ওপর স্থাপিত একটি পুল। এ পুল পার হয়ে জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আখিরাতে সকল মানুষকেই এ পুলের ওপর আরোহণ করে তা অতিক্রম করতে হবে। কিয়ামতের দিন আদ্বাহ তাআলা সকল মানুষের কুতকর্মের হিসাব নেবেন। যে নেক আমল করবে মহান আদ্বাহ তাঁকে জান্নাতে খাওয়ার অনুমতি দেবেন। জান্নাতিগণ সিরাতের ওপর দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁদের আমল অনুসারে সিরাত নানারকম হবে। কারো জন্য সিরাত হবে বিশাল ময়দানের মতো। আবার কম নেককারদের জন্য তাদের আমল অনুসারে সিরাতের প্রশস্ত কম হবে। ইমানদারগণ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী সিরাত অতিক্রম করবেন। কেউ বিদ্যুৎগতিতে সিরাত পার হবেন। কেউ ঝড়ের গতিতে, কেউ ঝোড়ার গতিতে, কেউ দৌড়ের গতিতে, আবার কেউ হেঁটে হেঁটে সিরাত পার হবেন। কম আমলকারী জান্নাতিগণ হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রমে সিরাত পার হবেন।

সিরাত হলো অশ্বকার পুল। সেখানে ইমান ও নেক আমল ব্যতীত আর কোনো আলো থাকবে না। সুতরাং দুনিয়ায় যে দৃঢ় ইমান এবং বেশি নেক আমলের অধিকারী হবে, সিরাত হবে তাঁর জন্য সবচেয়ে বেশি আলোকিত। ইমানের আলোতে সে

সহজেই সিরাত অতিক্রম করবে। জাহান্নামের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের দ্বিতীয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) সিরাত অতিক্রম করে জাহান্নামে প্রবেশ করবেন। তাঁর পূর্বে কেউই এ মর্যাদা লাভ করবে না।

অন্যদিকে জাহান্নামের জন্য সিরাত অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান। তাদের জন্য সিরাত হবে চুলের চাইতেও সুস্থ এবং ভরবারি অপেক্ষা ধারালো। সেখানে কোনো আলো থাকবে না। বরং সিরাত হবে ছুটছুটে অশুষ্ক। এমন অবস্থায় তারা সিরাতে আরোহণ করবে। তারা কিছুতেই সিরাত অতিক্রম করতে পারবে না। বরং তাদের হাত-পা কেটে তারা জাহান্নামে পতিত হবে।

সিরাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আত্মাহ বলেন,

وَأَن تَنكُمُ إِلَّا وَارِئَهَا ۖ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَكْمٌ مَّقْضِيًّا ۝

অর্থ : 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।' (সূরা মায্বীয়া, আয়াত ৭১)

এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ جَهَنَّمَ

অর্থ : 'জাহান্নামের ওপর সিরাত স্থাপিত হবে।' (মুসনাদে আহমাদ)

আমরা সিরাতে বিশ্বাস করব। সহজে সিরাত অতিক্রম করার জন্য দুনিয়াতে বেশি বেশি নেক আমল করব।

মিযান (الْمِيزَانُ)

মিযান অর্থ দাড়িপাল্লা, তুলাদণ্ড, মানদণ্ড বা পরিমাপ করার যন্ত্র। ইসলামি পরিভাষায় যে পরিমাপক যন্ত্রের দ্বারা কিয়ামতের দিন মানুষের পাপ-পুণ্যকে ওজন করা হবে, তাকে মিযান বলা হয়। আত্মাহ তাআলা বলেন-

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ : 'আর আমি কিয়ামতের দিন ন্যায্যবিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব।' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ৪৭)

আমরা নিশ্চয়ই দাড়িপাল্লা দেখেছি। এর দুটি পাল্লা থাকে এবং মাঝে একটি দণ্ড থাকে। এগুলোর মাধ্যমে আমরা নানা জিনিস পরিমাপ করে থাকি। মিযানও তেমনি একটি মানদণ্ড। এর দুটি পাল্লাতে মানুষের সকল আমল ওজন করা হবে। এর এক পাল্লায় থাকবে পুণ্য এবং অন্য পাল্লায় উঠনো হবে পাপ। যে ব্যক্তির পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে সে হবে জাহান্নামি। আর যে ব্যক্তির পুণ্যের পাল্লা হালকা হবে এবং পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে জাহান্নামি হবে। আত্মাহ তাআলা বলেন-

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۖ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝

অর্থ : 'এবং যাদের পাল্লা (পুণ্যের) ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।' (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত ১০২-১০৩)

মিয়ানের পান্ডায় পুশ্য বা নেক কাজ বেশি হলে মানুষ সফলতা লাভ করবে। তার স্থান হবে জান্নাত। এ জন্য বেশি বেশি নেক কাজ করা উচিত। শ্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) আমাদের নেকির পান্ডা ভারী করার জন্য বহু আমল শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدًا اَلْيَوْمَ

অর্থ : 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা মিয়ানের নেকির পান্ডা পূর্ণ করে দেয়।' (সহিহ মুসলিম)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন- 'দুটি বাক্য এমন আছে, যা দয়াময় আত্মাহর নিকট প্রিয়, উচ্চারণে সহজ এবং মিয়ানের পান্ডায় ভারী। এ দুটি বাক্য হলো-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ -

উচ্চারণ : সুবহানল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানল্লাহিল আযিম।

অর্থ : 'পবিত্রতা ও প্রশংসা আত্মাহর জন্য, তিনি মহান ও অতিশয় পবিত্র।'

আমরা এ দোয়া দুটি শিখব এবং বেশি বেশি পাঠ করব। এতে আমাদের নেকির পান্ডা ভারী হবে। আত্মাহ তাআলা আমাদের ভালোবাসবেন এবং আমরা আখিরাতে সফলতা লাভ করব।

দলীয় কাজ : আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

বাড়ির কাজ : আখিরাতের পর্যায়ভঙ্গের একটি ডালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ

১. কুরানের কুফল ও পরিণতি
২. ইমানের সর্বপ্রথম বিষয় হলো প্রতি বিশ্বাস।
৩. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
৪. হাদ্ব্যান শব্দের অর্থ
৫. রিসালাতে বিশ্বাস না করলে হওয়া যায় না।

ঝাম পাশের বাক্যগুলোর সাথে ডান পাশের বাক্যগুলোর মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. আকাইদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো	বিপরীত
২. কুফর হলো ইমানের	অপরিসীম
৩. নিশ্চয়ই শিরক চরম	শস্যক্ষেত্র
৪. মানবজীবনে আত্মাহর গুণবাচক নামসমূহের প্রভাব	তাওহিদ
৫. দুনিয়া হলো আখিরাতের	জুলাম

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কুফর অর্থ কী? উদাহরণসহ লিখ।
২. কী কী কাজ করলে কুফর প্রমাণিত হয়। পাঁচটি উদাহরণ দাও।
৩. রিসালাতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. তাওহিদের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
২. ইমান মুফাস্সালের বিষয়গুলো বর্ণনা করা।
৩. ‘কাফিরদের পরিণতি অভ্যস্ত ভয়াবহ’ – উক্তিটির বিশ্লেষণ কর।
৪. ওহির প্রকারভেদ লিখে ওহি নাখিলের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মহান আত্মাহকে একক সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করাকে কী বলে?
ক. আকাইদ খ. তাকওয়া
গ. তাওহিদ ঘ. আনুগত্য।
২. শিরকের মাধ্যমে মানুষ –
i. আত্মাহ ছাড়া অন্য কিছুই ইবাদত করে
ii. রিসালাতে অবিশ্বাস করে
iii. অন্য সৃষ্টির কাছে মাথা নত করে।

কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

হামি ও সাকিব কল্প। ছামি নামাষ আদায় করে, কিছু সাকিব তা আদায় করতে অস্বীকৃতি জানায়। ছামি এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য সাকিবকে বোঝানোর চেষ্টা করে।

৩. সাকিবের এ কাজটি কিসের শামিল?

- | | |
|----------------|--------------|
| ক. কুফরির | খ. মুনাফিকির |
| গ. বিনয়াক্তের | গ. শিরকির। |

৪. ছামির বোঝানোর বিষয়টি হচ্ছে -

- সামাজিক দায়িত্ব পালন
- ইমানি দায়িত্ব পালন
- মুত্তাকি হওয়ার বাসনা

কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সমাজপতি রাজা মিয়ান ভয়ে মানুষ তটস্থ থাকে। তিনি মানুষকে অকথ্য ভাষায় পালাপাল করেন এবং তিনি যা বলেন তাই করতে বাধ্য করেন। তার প্রকল্পে কর্মরত জনাব ফরিদ উদ্দিনকে নামাষ পড়তে নিষেধ করে বলেন, নামাষ আবার কিসের জন্য, কাজ কর তাহলেই সুখ পাবে। কিছু ফরিদ উদ্দিন নিয়মিত নামাষ আদায় করেন এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। অবশেষে কর্তৃপক্ষ ফরিদ উদ্দিনের দায়িত্বশীলতার খুশি হয় এবং তাকে পদোন্নতি দেয়।

- তাওহিদ শব্দের অর্থ কী?
- অধিরাতে বলতে কী বোঝায়?
- নামাযের প্রতি রাজা মিয়ান মনোভাব ইসলামের দৃষ্টিতে কীসের শামিল? ব্যাখ্যা কর।
- যে মূল বিশ্বাসের ফলে ফরিদ উদ্দিন নামাযে দৃঢ় ও দায়িত্বশীল-তা বিশ্লেষণ কর।

২। বিজ্ঞ বিচারক জাকারিয়া সাহেব ন্যায়বিচার করেন। এতে ঘুষ লেনদেনকারী দালাল গোষ্ঠী তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয়। এমনকি তাকে বদলি করানোর জন্য লেগে যায়। বিচারক সাহেব এটা জানার পরেও ঠাণ্ডা মাথায় বৈধধারণ করেন। আসমাউল হুসনার বিষয়গুলো নিজের জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেন এবং আত্মাহার ভয়ে সবদময় ভীত থাকেন। বিচারকের এমন মহৎ চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে অবশেষে দালাল গোষ্ঠী তার প্রতি প্রশংসাপূর্ণ হয়।

- আসমাউল হুসনার অর্থ কী?
- আসমাউল হুসনা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান থাকা আবশ্যিক কেন? বুঝিয়ে লিখ।
- আত্মাহার যে গুণের ভয়ে বিচারপতি ভীত থাকেন তা ব্যাখ্যা কর।
- 'আত্মাহার সাবুদন' গুণের সাথে বিচারকের গুণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

বিত্তীয় অধ্যায় ইবাদত (الْعِبَادَةُ)

‘ইবাদত’ আরবি শব্দ। এর অর্থ দাসত্ব, বন্দেগি, আনুগত্য ইত্যাদি। আদ্বাহ প্রদত্ত ও রাসুলুল্লাহ (স.) প্রদর্শিত পন্থায় জীবন পরিচালিত করাকেই ইবাদত বলে। সালাত, সাওম, যাকাত, হজ ইত্যাদি আমরা যেমনি ইবাদত হিসেবে পালন করে থাকি, তেমনি জীবনের প্রতিটি কাজ ইসলামি বিধিবিধান মোতাবেক সম্পন্ন করাও ইবাদতের অংশ। আদ্বাহ জিন ও মানবসম্মানকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

শিখনফল : এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- ইমাম ও মুক্তাসির দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার সালাতের পরিচয় – মাসবুকের সালাত, মুসাফিরের সালাত, রুশন ব্যাক্তির সালাত, জুমুআর সালাত, ঈদের সালাত, জানাযার সালাত, তারাবিহের সালাত, তাহাজ্জদের সালাত, আওরাবিনের সালাত ও ইশরাকের সালাত সম্পর্কে বলতে পারব।
- সালাতের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাওমের ধারণা, প্রকরভেদ এবং সাওম ভঙ্গের কারণ, সাওম মাকসুহ হওয়ার কারণ, সাওমের কাফা ও কফফরা সম্পর্কে বলতে পারব।
- সাহরি ও ইফতারের পরিচয়, সময়সূচি ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- ইতিকাক এবং সাদাকাতুল ফিতরের ধারণা, তাৎপর্য ও আদায়ের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাওমের নৈতিক উপকার সম্পর্কে বলতে পারবে। বাস্তব জীবনে সংযম, সহমর্মিতা ও সহিষ্ণুতা অনুশীলনে সাওমের (রোযার) গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ -১

সালাত (الصَّلَاةُ)

ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সালাত বা নামায অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আদ্বাহর নিকট বান্দার আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে সালাত। সালাতের মাধ্যমেই বান্দা আদ্বাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করতে পারে।

সালাত হচ্ছে আল্লাহের চাবিকাঠি ও আদ্বাহর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম। সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কর্মকাণ্ড হতে বিরত রাখে। সালাতের প্রভাবে মানুষ শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা, কর্তব্য-পরায়ণতা ইত্যাদি গুণে গুণাবিত হয় এবং ধনী-গরিব, সাদা-কালো মানুষের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জন্মাত হয়।

জামাআতে সালাত

জামাআত আরবি শব্দ। এর অর্থ একত্রিত হওয়া, সমবেত হওয়া প্রভৃতি। ইসলামি পরিভাষায়, নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট

জায়গায় মুসলিম সম্প্রদায় ইমামের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সালাত আদায় করাকে জামাআতে সালাত আদায় বলে।

জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব

ফরয সালাত একাকী আদায় করার চেয়ে জামাআতে আদায় করার প্রতি বিশেষ তাগিদ রয়েছে। আত্মাহুতআলা বলেন:

وَأَزْكُوَامَعَ الرَّائِعِينَ

অর্থ: 'তোমরা নিক্তকারীদের সাথে নিক্ত কর।' (সূরা আল-বাকারা: ৪৩)

নবি করিম (স.) জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন: 'এককী সালাত আদায় অপেক্ষা জামাআতে আদায় করলে সাভাপশুণ বেশি সাওয়ার পাওয়া যায়।' (বুখারি ও মুসলিম)। জামাআতে সালাত আদায়কারীকে নবি করিম (স.) খুবই পছন্দ করতেন। তিনি নিজে কখনও জামাআত ত্যাগ করেননি। আবার কেউ জামাআতে উপস্থিত না হলে তিনি খোঁজ নিতেন এবং এতে মহানবি (স.) অসন্তুষ্ট হতেন। তাই আত্মাহুত গণকের সম্বন্ধি অর্জন ও অধিক সাওয়ার পাওয়ার আশার প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে জামাআতে সালাত আদায় করতে হবে।

ইমাম

ইমাম অর্থ নেতা। যিনি সালাত পরিচালনা করেন, তিনিই ইমাম। অন্য কথায়, জামাআতে সালাত আদায়ের সময় মুসল্লিগণ (মুস্তাদি) যাকে অনুসরণ করে সালাত আদায় করে, তাকে ইমাম বলে। যার কিরাআত শুণ্য, সুন্দর ও ইসলামি জ্ঞান বেশি এবং বয়সে বড় তিনিই ইমাম হওয়ার যোগ্য। তাই একজন যোগ্য ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নির্বাচন করা উচিত।

ইমামের কর্তব্য

ইমামের কর্তব্য হচ্ছে সালাতে কাতার সোজা হলো কি না সেদিকে দৃষ্টি রাখা। মুসল্লিদের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষা করা। সং উপদেশ দেওয়া এবং মুসল্লিদের প্রতি দায়িত্ব বখায্য ভাবে পালন করা। ইমাম হিসেবে, বিশেষ, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ইসলাম বহির্ভূত কাজকর্ম থেকে দূরে থাকবেন। তাঁর উচিত মুসল্লিদের অবস্থা দেখে সালাতে তিলাওয়াত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত করা। মুসল্লিদের মধ্যে অনেকে বৃশ, কপাল, দুর্বল ও মুসাফির থাকতে পারে, তাই ইমামকে সকলের প্রতি লক্ষ্য রেখে সালাত আদায় করতে হবে। জামাআতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষকে শৃঙ্খলাবোধ, সমন্বয়বৃত্তি ও নেতার প্রতি আনুগত্য শিক্ষা দেয়। মানুষকে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে এবং সামাজিক ঐক্যের প্রতিফলন ঘটায়।

মুস্তাদি

ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে অনুসরণপূর্বক বারো সালাত আদায় করে, তাঁদের মুস্তাদি বলা হয়। মুস্তাদি এই বলে সালাতের নিয়ত করবে যে 'আমি এই ইমামের পেছনে সালাত আদায় করছি।' সালাতের যাবতীয় কাজে মুস্তাদিকে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। মুস্তাদিগণ ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। যদি মুস্তাদি একজন হয় তবে ইমামের ডান দিকে কিছুটা পিছনে দাঁড়াবে। যদি ইমাম তিলাওয়াতে ভুল করেন, তাহলে নিকটবর্তী মুস্তাদি সংশোধন করে দিবে। আর যদি অন্য কোনো কাজে ভুল করেন, যেমন: দাঁড়ানোর পরিবর্তে বসে, বসার পরিবর্তে দাঁড়ায়, তবে 'সুবহানাল্লাহ' বলে ইমামকে সংশোধন করে দিবে। (বুখারি)



সালাত শেষে মুসল্লিগণ একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করবে। নিয়মিত কোনো মুসল্লি অনুপস্থিত থাকলে তার খোজ খবর নিবে। নিয়মিতভাবে উক্ত অভ্যাস চর্চা করলে গভীর আত্মতৃপ্তি পাওয়া যাবে। ইমামের ভুল হলে বিরোধিতা না করে সংশোধনের জন্য সহযোগিতা করবে।

দলীয় কাজঃ শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে ইমাম ও মুক্তাদির কর্তব্যগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টার পেপারে মার্কার দিয়ে লিখবে।
বাড়ির কাজঃ জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

পাঠ-২

বিভিন্ন প্রকার সালাত মাসবুকের সালাত (صَلَاةُ الْمَسْبُوكِ)

যে ব্যক্তি নামাযে এক বা একাধিক রাকআত শেষ হওয়ার পর ইমামের সাথে জামাআতে অংশগ্রহণ করে, তাকে মাসবুক বলে।

মাসবুকের সালাত আদায়ের নিয়ম

মুসল্লি জামাআতে সালাত আদায় করতে গিয়ে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থাতেই নিয়ত করে নামাযে অংশগ্রহণ করবে। তারপর ইমামের সাথে যথারীতি বুকু সিজদা করে তাশাহুদ পাঠের জন্য বসে যাবে। ইমাম সালাম ফিরলে সে মুসল্লি সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো বুকু, সিজদা করে যথারীতি তাশাহুদ, দরুদ, দোয়া মাসুবা পড়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করবে। বুকুসহ ইমামের সাথে যে কয় রাকআত পাওয়া যায় তা আদায় হয়ে যায়। বুকুর পর ইমামের পিছনে ইক্বেদা বা নামাযে দাঁড়ালে ঐ রাকআত মাসবুককে আদায় করতে হবে।

মুক্তাদির সালাত এক, দুই, তিন, চার রাকআত ছুটে গেলে, তা আদায়ে কিছুটা ত্বরান্বিত রয়েছে।

নিম্নে এসবের বর্ণনা করা হলো :

মুক্তাদি ইমামের পিছনে ইক্বেদা করার পর যদি এক রাকআত ছুটে যায়, তবে ইমামের সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া এক রাকআত একাকী সালাত আদায়ের ন্যায় আদায় করে নিবে।

দুই রাকআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া দুই রাকআত যথা নিয়মে আদায় করবে, যেভাবে ফজরের দুই রাকআত করণ সালাত একাকী আদায় করা হয়।

তিন রাকআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। এক রাকআত যথানিয়মে আদায় করে প্রথম বৈঠক করবে। ঐ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর আবার দাঁড়িয়ে যাবে এবং বাকি দুই রাকআত যথানিয়মে আদায় করে শেষ বৈঠকে তাশাহুদ, দরুদ, দোয়া মাসুবা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে।

চার, তিন, দুই রাকআত বিসিষ্ট নামাযে মুক্তাদি ইমামকে শেষ বৈঠকে গেলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। যথানিয়মে ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো এমনভাবে আদায় করে নিবে, যেভাবে একজন মুসল্লি একাকী চার, তিন, দুই

রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায় করে থাকে।

দশীয় কাজ: কোনো এক শিক্ষার্থী মাগরিবের নামায আদায় করতে মসজিদে গিয়ে ইমামের সাথে এক রাকআত পেয়েছে। অবশিষ্ট নামায কীভাবে আদায় করবে? শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

মুসাফিরের সালাত (صَلَاةُ الْمُسَافِرِ)

‘মুসাফির’ আরবি শব্দ। এর অর্থ ভ্রমণকারী। কমপক্ষে ৪৮ মাইল দূরবর্তী কোনো স্থানে যাওয়ার নিয়তে কোনো ব্যক্তি বাড়ি থেকে বের হলে শরিয়তের পরিভাষায় তাকে মুসাফির বলে। এমন ব্যক্তি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কমপক্ষে পনের দিন অবস্থানের নিয়ত না করা পর্যন্ত তার জন্য মুসাফিরের হুকুম প্রযোজ্য হবে। শরিয়তে মুসাফিরকে সৎফিক্ত আকারে সালাত আদায়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই সৎফিক্তকরণকে আরবিতে কসর বলা হয়। মুসাফির অবস্থায় যুহর, আসর ও ইশার ফরয সালাত কসর পড়তে হয়। যেমন, আব্দুল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ

অর্থ: ‘যখন তোমরা দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন সালাত সৎফিক্ত করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই।’

(সূরা আন-নিসা, আয়াত ১০১)

মুসাফিরের জন্য কসর সালাত আদায় করার অনুমতি আব্দুল্লাহ তাআলার এক বিশেষ অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহের পুরস্কারে মহানবি (স.) বলেন: ‘এটি একটি সাদাকা, যা আব্দুল্লাহ তাআলা তোমাদের (মুসাফিরদের) দান করেছেন। এ সাদাকা তোমরা গ্রহণ কর।’ (বুখারি ও মুসলিম)

মুসাফিরের সালাত আদায়ের নিয়ম

চার রাকআত বিশিষ্ট অর্থাৎ যুহর, আসর, ও ইশার ফরয সালাত মুসাফির ব্যক্তি দুই রাকআত করে আদায় করবে। ফজর, মাগরিব ও বিতরের নামাযে কসর নেই। এগুলো পুরোপুরি আদায় করতে হবে।

আব্দুল্লাহ দেওয়া সকল সুযোগ-সুবিধা খুশি মনে গ্রহণ করা উচিত। কাজেই কোনো মুসাফির ব্যক্তি যদি ইচ্ছে করে যুহর, আসর বা ইশার ফরয সালাত চার রাকআত আদায় করে, তবে আব্দুল্লাহ দেওয়া সুযোগ গ্রহণ না করার গুনাহগার হবে। কিন্তু ইমাম যদি মুকিম (স্থায়ী) হয়, তা হলে সে ইমামের অনুসরণ করে পূর্ণ সালাত আদায় করবে। সফর একটি কষ্টকর বিষয়। তাই আব্দুল্লাহ তাঁর বাপার ওপর সালাত সৎফিক্ত করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

দশীয় কাজ: মুসাফির অবস্থায় কোন্ কোন্ নামায পূর্ণ এবং কোন্ কোন্ নামায কসর পড়তে হয় তার একটি তালিকা পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

হুণ ব্যক্তির সালাত (صَلَاةُ الْمَرْيُوسِ)

রোগী বা অক্ষম ব্যক্তি যথানিয়মে সালাত আদায় করতে না পারলে, তার জন্য ইসলামে সহজ নিয়মের অনুমোদন রয়েছে। রোগীর সেই সহজ নিয়মে সালাত আদায়কে হুণ ব্যক্তির সালাত বলে।

হুণ ব্যক্তির সালাত আদায়ের নিয়ম

হুণ ব্যক্তির জন্য জ্ঞান থাকা পর্যন্ত সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। রোগ যত কঠিন হোক না কেন, সম্পূর্ণরূপে অশারণ না হলে সালাত ত্যাগ করা যাবে না। রোগীর দাঁড়াতে কষ্ট হলে বসে বুকু-সিজদার সাথে সালাত আদায় করবে। বুকু-সিজদা করতে অক্ষম হলে বসে ইশারায় সালাত আদায় করবে। ইশারা করার সময় বুকু অপেক্ষা সিজদায় মাথা একটু বেশি নত করতে হবে। মাথা দিয়ে ইশারা করতে হবে, চোখে ইশারা করলে সালাত আদায় হবে না। হুণ ব্যক্তিকে বসার সময় সালাতের অবস্থায় বসতে হবে। যদি রোগী এতোই দুর্বল হয় যে বসে থাকা সম্ভব নয়, তবে কিবলার দিকে পা দুটি রাখতে হবে। পা সোজা না রেখে হাঁটু উঠু করে রাখতে হবে এবং মাথার নিচে বাগিশ বা এ জাতীয় কিছু জিনিস রেখে মাথা একটু উঠু রাখতে হবে। শূন্যে ইশারায় বুকু ও সিজদা করবে অথবা উত্তর দিকে মাথা রেখে কাত হয়ে শূন্যে এবং কিবলার দিকে মুখ রেখে ইশারায় সালাত আদায় করবে। যদি এভাবেও সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে তার ওপর সালাত আর ফরয থাকে না, মাফ হয়ে যায়। অশারণ অবস্থায় বা কেউ বেইশ হয়ে পড়লে যদি চব্বিশ ঘণ্টা সময় অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বা তার চেয়ে কম সময় অতিক্রান্ত হয়, তাহলে সাক্ষম হওয়ার পর হুণ ব্যক্তিকে কাবা করতে হবে। যদি পাঁচ ওয়াক্তের বেশি সময় অতিবাহিত হয়, তবে আর কাবা করতে হবে না। এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে সালাত এমন একটি ইবাদত, যা সাক্ষমতার শেষ সীমা পর্যন্ত আদায়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে। কোনোভাবেই সালাত ত্যাগ করা যায় না।

দলীল কাছ : হুণ ব্যক্তির নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা প্রণীত আলোচনা করবে।

জুমার সালাত (صَلَاةُ الْجُمُعَةِ)

সালাত এবং জুমুআ দু'টিই আরবি শব্দ। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় জুমার সালাত। শুকবার যুহরের সময়ে যুহরের সালাতের পরিবর্তে যে সালাত আদায় করা হয়, তাকে বলা হয় জুমার সালাত। প্রতি শুকবার জামে মসজিদে জুমার সালাত জামাআতে আদায় করা হয়।

গুরুত্ব

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ন্যায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, মাহীন, মুসলিম পুরুষের ওপর জুমার সালাত আদায় করা ফরয। আর এর অধীকারকারী কফির। অবহেলা করে কেউ এ সালাত আদায় না করলে সে ফাসিক হয়ে যাবে। জুমার সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّى لَصَلَاةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ : 'হে মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, এটি তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।' (সূরা আল-জুমুআ, আয়াত ৯)।

জুমার দিন সপ্তাহের উত্তম দিন। এদিনে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়। এদিনে তাঁর তাওবা কবুল হয়। এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এ দিন সোয়া কবুলের উত্তম দিন। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন: 'যে ব্যক্তি শুব্বারের গোসল করে যথাসম্ভব পবিত্র হয়ে সুশুশি লাগিয়ে জুমার সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যায়, মসজিদে গিয়ে কটিকে কষ্ট না দিয়ে যেখানে জায়গা পায় সেখানেই বসে যায়, যথাসম্ভব সালাত আদায় করে এবং নীরবে বসে মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনে, আল্লাহ তাআলা তার বিগত জুমা হতে এ জুমা পর্যন্ত সকল (সগিরা) গুনাহ মাফ করে দেবেন।' (বুখারি)

জুমার সালাত আদায় না করলে ইসলামে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। যেমন: মহানবি (স.) বলেন: 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে পর পর তিন জুমা ত্যাগ করে, তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয় এবং তার অন্তরকে মুনিফেকের অন্তরে পরিণত করে দেওয়া হয়।' (তিরমিযি)

জুমার সালাত আদায়ের নিয়ম

প্রথমে মসজিদে গিয়ে তাহিয়্যাতুল ওহু ও দুখুল মসজিদ দুই দুই রাকআত করে নফল সালাত আদায় করতে হয়। ফরযের আগে চার রাকআত কবলাল জুমা ও পরে চার রাকআত বাদাল জুমা আদায় করা সুন্নাতে মুয়াকাদ্দাহ।

জুমার সালাতের জন্য দুটি আযান দেওয়া হয়। প্রথম আযান মসজিদের বাইরে মিনারে, দ্বিতীয়টি মসজিদের ভেতরে ইমাম সাহেব খুতবা দিতে মিন্বরে বসলে দেওয়া হয়। জুমার দুই রাকআত ফরযের পূর্বে ইমাম সাহেব মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে মিন্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দেন। মুসল্লিদের খুতবা শোনা ওয়াজিব। এ সময় কথা বলা, অনবরক কিছু করা নিষেধ। খুতবা শেষে ইমামের সাথে দুই রাকআত ফরয সালাত অন্যান্য ফরয সালাতের ন্যায় আদায় করতে হয়। জুমার ফরযের জন্য জামাআত শর্ত। জামাআত ছাড়া জুমা সালাত হয় না। কোনো কারণে জুমাতে অংশগ্রহণ করতে না পারলে যুহরের সালাত আদায় করতে হয়। কাজেই জুমার সালাত যুহরের সময়েই পড়তে হবে।

সামাজিক শিক্ষা

জুমার সালাতে এলাকার লোকজন একত্রিত হয়। পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হয় এবং কুশলাদি বিনিময়ের সুযোগ হয়। সুখে-দুঃখে একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা করার সুযোগ হয়। ইমামের পিছনে সব ধরনের হিংসা-বিষেধ তুলে গিয়ে কাঁখে কাঁখি মিলিয়ে মুসল্লিগণ সালাত আদায় করে থাকে। ফলে সকলের মধ্যে সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। মুসলিম ঐক্য আরও সুদৃঢ় হয়। সপ্তাহে একবার মিলিত হওয়া ও নেতার আদেশ-নিষেধ শ্রুনে, তা মেনে চলার এক অনুপম আদর্শ প্রকাশিত হয় জুমার সালাতে। গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, যথাসম্ভব পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা ও প্রথম কাতারে বসার মানসিকতা বৃদ্ধি পায়। মন প্রফুল্ল থাকে।

দলীয় কাজ : জুমার সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীগণ শ্রেণিতে আলোচনা করবে।

পাঠ - ৩

ঈদের সালাত

ঈদ আরবি শব্দ। এর অর্থ আনন্দ, উৎসব ইত্যাদি। ঈদের দিন হলো মুসলমানদের মহামিলন ও জাতীয় খুশির দিন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেছেন: 'প্রত্যেক জাতিরই উৎসবের দিন আছে। আর আমাদের উৎসব হলো ঈদ।' (বুখারি ও মুসলিম)

বছরে দুটি ঈদ। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আয্হা। ঈদের দিন এলাকার মুসল্লীগণ একত্রে ঈদগাহে যান এবং দুই রাকআত ঈদের সালাত আদায় করে আয্হাহর শুকরিয়া জানান।

ঈদুল ফিতর (عِيدُ الْفِطْرِ)

ঈদ মানে আনন্দ। আর ফিতর অর্থ সাওম বা রোযা তলা করা। ঈদুল ফিতর অর্থ সাওম তজের আনন্দ। সুদীর্ঘ একটি মাস আয্হাহর নির্দেশ মতো রোযা পালনের পর বিশৃঙ্খল মুসলিম সম্প্রদায় এদিনে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আনন্দ-উৎসব করে বলে একে ঈদুল ফিতর বলা হয়। রমযানের পর শাওরাল মাসের প্রথম দিন মুসলমানগণ এ উৎসব পালন করে। আয্হাহ তাজালা বান্দাদের ওপর রমযান মাসে যে ইবাদত নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তা পালন করার তাওফিক দান করার মুসলমানগণ আয্হাহর দরবারে এদিন শুকরিয়া জানান এবং দুই রাকআত ঈদুল ফিতরের ওয়াজিব সালাত আদায় করেন।

গুরুত্ব

ঈদের দিন আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের বোজাখবর নিতে হয়। সাধ্যমতো তাদের বাসায় মিষ্টান্ন বাদ্য যেমন: মিঠা, পায়স, সেমাই ইত্যাদি খাবার পাঠাতে হয়। ধনী, গরিব, মিসকিন সকলের সাথে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে হয়। এতে সকলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ঈদ আসে আনন্দের বার্তা নিয়ে, আসে সীমাহীন শ্রীতি, ভালোবাসা ও কল্যাণের সংবাদ নিয়ে। সেই ঈদকে যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

ঈদুল ফিতরের দিন দুটি কাজ ওয়াজিব: ১. ফিতরা দেওয়া ২. ঈদের দুই রাকআত সালাত ছয় তাকবিরের সাথে অদায় করা।

ঈদের দিনে সন্নাত কাজ

১. সোঁসল করা।
২. সুগন্ধি ব্যবহার করা।
৩. পরিব্রাজ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা।
৪. সালাত আদায়ের পূর্বে মিষ্টি জাতীয় খাদ্য খাওয়া।
৫. মরদানে গিয়ে ঈদের সালাত আদায় করা।
৬. ঈদগাহে যাওয়ার সময় তাকবির বলতে বলতে যাওয়া।
৭. এক রাস্তায় ঈদগাহে যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় ফিরে আসা।

ঈদের তাকবির

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

(উচ্চারণ: আয্হাহ আকবার আয্হাহ আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আয্হাহ আকবার ওয়ালিল্লাহি হামদ।)

ইসদের সামাজিক শিক্ষা: বছরে দু'দিন মহান আল্লাহ মানুষের জন্য সম্মিলনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তারা হিন্দো-বিষেধ, ভেদাভেদ ইত্যাদি ভুলে গিয়ে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। রমযানের রোযা পালনের মাধ্যমে মানুষের তৃষ্ণা-ক্ষুধার ভাণা অনুভব করে গরিবদের প্রতি সহযোগিতা ও সহর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। সর্বোপরি গড়তে পারে একটি শান্তিপূর্ণ আদর্শ সমাজ।

দলীয় কাজ: শিক্ষার্থীদের ঈদুল ফিতর দিনের ওয়াজিব ও সুন্নাত কাজগুলোর চার্ট তৈরি করে পোস্টার পেপারে লিখবে।

বাড়ির কাজ: ঈদুল ফিতরের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

ঈদুল আযহা (عِيدُ الْأَضْحَى)

‘ঈদুল আযহা’ শব্দটির আরবি। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় কুরবানির ঈদ। বিশ্ণু মুসলিম জাতি ত্যাগের নিদর্শন স্বরূপ মহাসমারোহে পশু যবেহ করার মাধ্যমে যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখ যে উৎসব পালন করে থাকে, তাকে ঈদুল আযহা বলে। আল্লাহর নবি হযরত ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর ইজিলতে তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-কে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানি করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। পুত্র ইসমাইল (আ.)ও এটাই আল্লাহর ইচ্ছা জানতে পেরে অলসিত চিত্তে তা গ্রহণ করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ইসমাইল (আ.) এর পরিবর্তে একটি দুধা কুরবানি হয়। এ স্মৃতি রক্ষার্থে মুসলমানগণ প্রতিবছর কুরবানি করে থাকেন। কুরবানির অতুলনীয় ইতিহাস স্মরণ করে মুসলমানগণ আল্লাহর দরবারে এ দিন শপথ করে বলেন, যে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির জন্য যেভাবে আমরা পশুর রক্ত প্রবাহিত করছি, তেমনিভাবে আমরা তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করতেও সदा প্রস্তুত আছি।

গুরুত্ব

অর্থিক সংগতিসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলমানকে কুরবানি করতে হয়। এটা আল্লাহর বিধান। শূয় গোশত বা রক্তের নাম কুরবানি নয় বরং আল্লাহর নামে সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার এক আন্তরিক শপথের নাম কুরবানি। কুরবানির মাধ্যমে মুসলমানের ইমান ও তাকওয়ার পরীক্ষা হয়ে থাকে। আর এই তাকওয়াই হচ্ছে কুরবানির প্রাণশক্তি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ط

অর্থ: ‘আল্লাহর নিকট সেগুলোর (কুরবানির পশুর) গোশত এবং রক্ত পৌঁছায় না বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।’
(সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ৩৭)

কুরবানির গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন: ‘কুরবানির রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা কবুল হয়ে যায়।’ (তিরমিহি)। তিনি আরও বলেন, ‘কুরবানির পশুর প্রত্যেকটি পশমের জন্য একটি করে সাওয়াব পাওয়া যায়।’ (ইবনে মাজাহ)। সামর্থ্যবান ব্যক্তি কুরবানি না করলে রাসুলাহ (স.) অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, ‘যে ব্যক্তির সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি না করে, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে’ (আবু দাউদ)। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও অশেষ পুণ্য পাওয়ার আশায় খুশি মনে কুরবানি করবো।

কুরবানির গোশত বিতরণে মুস্তাহাব বিধান

কুরবানির গোশত তিন ভাগে ভাগ করে একভাগ নিজের জন্য রেখে একভাগ আত্মীয় ও প্রতিবেশীকে এবং একভাগ গরিব মিসকিনকে দিতে হয়। এতে ধনীদের সাথে গরিবরাও ঈদের আনন্দে অংশীদার হওয়ার সুযোগ পায়।

ঈদুল আযহার ওয়াজিব কাজ: ১. অতিরিক্ত ছয় তাকবিরের সাথে ঈদুল আযহার দুই রাকআত সালাত আদায় করা।

২. কুরবানি করা। এ ছাড়া যিলহজ মাসের ৯ তারিখ যজ্ঞর হইতে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয সালাতের পর তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বাঁধবে। সানা পড়বে। তারপর ইমাম সাহেবের সাথে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবে। প্রত্যেক তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠবে। প্রথম দুই তাকবিরে হাত বাঁধবে না। তৃতীয় তাকবিরে অন্যায় সালাতের ন্যায় হাত বাঁধবে। ইমাম সাহেব স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম রাকআত শেষ করে দ্বিতীয় রাকআতের বুকুতে বাওয়ার পূর্বে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবেন। মুসল্লিগণও তাঁর সাথে তাকবির বলবে। তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দেবে, হাত বাঁধবে না। চতুর্থ তাকবিরে বুকুতে যাবে। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে সালাত শেষ করবে। সালাত শেষে ইমাম সাহেব দুটি খুতবা দেবেন। প্রত্যেক মুসল্লির খুতবা শোনা ওয়াজিব। ঈদের মাঠে যাবার পথে ঈদুল আযহার তাকবির ঈদুল ফিতরের তাকবিরের অনুরূপ। আর ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের পশ্চিতি একই, শুধু নিয়তের বেলায় আলাদা নিয়ত করতে হবে।

ঈদের সালাত আদায়ের নিয়ম

ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের সালাত আদায় করা যায়। প্রথমে কাতার করে নিয়ত করবে। তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বাঁধবে। সানা পড়বে। তারপর ইমাম সাহেবের সাথে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবে। প্রত্যেক তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠবে। প্রথম দুই তাকবিরে হাত বাঁধবে না। তৃতীয় তাকবিরে অন্যায় সালাতের ন্যায় হাত বাঁধবে। ইমাম সাহেব স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম রাকআত শেষ করে দ্বিতীয় রাকআতের বুকুতে বাওয়ার পূর্বে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবেন। মুসল্লিগণও তাঁর সাথে তাকবির বলবে। তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দেবে, হাত বাঁধবে না। চতুর্থ তাকবিরে বুকুতে যাবে। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে সালাত শেষ করবে। সালাত শেষে ইমাম সাহেব দুটি খুতবা দেবেন। প্রত্যেক মুসল্লির খুতবা শোনা ওয়াজিব। ঈদের মাঠে যাবার পথে ঈদুল আযহার তাকবির ঈদুল ফিতরের তাকবিরের অনুরূপ। আর ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের পশ্চিতি একই, শুধু নিয়তের বেলায় আলাদা নিয়ত করতে হবে।

সামাজিক শিক্ষা

ঈদের দিনে আমরা ভেদাভেদ ভুলে যাব। বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করব। একে অন্যের সাথে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নিব, পরস্পরের সাথে সম্প্রীতি ও দ্রাভুত্ব গড়ে তুলব। একে অন্যের থেকে ভালোবাসার শিক্ষা গ্রহণ করব। পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতার আমাদের জীবনকে সুন্দর করে গঠন করার শিক্ষা গ্রহণ করব। সামাজিক সাম্যের শিক্ষা গ্রহণ করব।

দলীয় কাজ : ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাত সমবেত ক্লাসে একজন শিক্ষার্থী আদায় করে দেখাবে, অন্যরা ভুলগুলো তাদের নিজ নিজ খাতায় লিখবে। পরে আলোচনা করবে।

পাঠ-৪

সালাতুল জানাযা (صَلَاةُ الْجَنَازَةِ)

পরিচয়

‘সালাতুল জানাযা’ দুটিই আরবি শব্দ। প্রচলিত ভাষার বলা হয় জানাযার সালাত বা জানাযার নামায। মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কবরস্থ করার পূর্বে চার তাকবিরসহ যে সালাত আদায় করা হয়, তাকে জানাযার সালাত বলে। জানাযার সালাত ঘরগে কিয়াম। এলাকার কিছুসংখ্যক লোক এ সালাত আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে সালাত আদায় হয়ে যায়। কেউ আদায় না করলে এলাকার সবাই গুনাহগার হয়। এ সালাতে বুকু-সিজদাহ নেই।

মৃত্যু ও তাৎপর্য

মানুষ মরণশীল। প্রত্যেককেই একদিন না একদিন মরতে হবে। মৃত ব্যক্তির প্রতি জীবিতদের অনেক কর্তব্য আছে। মৃতকে পোসল দেয়া, কাফন পরানো, তার জানাযার সালাত আদায় করা এবং সবশেষে তাকে কবরস্থ করা একান্ত কর্তব্য। মূলত জানাযার সালাত হলো মৃত ব্যক্তির জন্য সোয়া। যত বেশি লোক একত্রিত হয়ে সোয়া করবে ততই তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই জানাযার সালাতে লোক সংখ্যা যত বেশি হবে, ততই ভালো, কিন্তু লোকসংখ্যা বেশি হওয়ার জন্য জানাযা বিলম্ব করা ঠিক নয়। অধিক লোক একত্রিত করার জন্য মৃত্যুর সংবাদ চারদিকে প্রচার করা উচিত। আত্মাহুর নিকট একদিন আমাদেরও ফিরে যেতে হবে, এ সালাত সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন: ‘যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করবে, তার জন্য এক কিরাত (সাতওয়ার) এবং যে ব্যক্তি দাফনকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে, তার জন্য দুই কিরাত (সাতওয়ার)। এক একটি কিরাত হলো উল্লুদ পাহাড় পরিমাণ।’ (তিরমিযি)

জানাযার সালাত আদায়ের নিয়ম

মৃত ব্যক্তিকে পোসল করিয়ে কাফন পরানোর পর ইমাম তাকে সামনে রেখে তার হুক বরাবর দাঁড়াবেন। মুক্কাদিগল ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। তারপর মনে মনে নিয়ত করবে, ‘আমি কিবলাদুখী হয়ে এই ইমামের পিছনে চার তাকবিরের সাথে জানাযার সালাত ফরযে কিফায়া আদায় করছি।’

প্রথম তাকবির বলে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে হাত বঁধবে। পরে সানা পড়ে হাত বঁধা অবস্থাতেই ইমামের সাথে দ্বিতীয় তাকবির বলবে। তারপর দরুল শরিফ পড়ে ইমামের সাথে তৃতীয় তাকবির বলবে। তারপর নিম্নের সোয়াটি পড়বে:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَايَتِنَا وَصُفْرَتَنَا وَكِبْرَتَنَا وَذِكْرَنَا وَانْقَاثَنَا - اَللّٰهُمَّ مَنْ اَخْيَرْتَهُ مِنَّا فَارْحِمِهِ
عَلَى الْاِسْلَامِ - وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَلَّهِ عَلَى الْاِيْمَانِ -

উচ্চারণ: ‘আল্লাহ্ মাফির লিহ-ইয়িনা ওয়া মায়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িদিনা ওয়া ছাগিদিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া ফাকিরিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহ্ মাফ মান অহ-ইয়রিহিতাহু মিন্না ফাঅহরিহি আল্লাল ইসলামি ওয়ামান তাওয়াফ্ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ ফাহু আল্লাল ইমান।

এই সোয়া পড়ে চতুর্থ তাকবির বলে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে। তাকবির বলার সময় হাত উঠবে না। মৃত ব্যক্তি যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক হয়, তবে তৃতীয় তাকবিরের পর নিম্নের সোয়াটি পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرْطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَدُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعًا وَمُسَفِّعًا

উচ্চারণ: ‘আল্লাহ্ মাফ আলহু লানা ফরাতীও ওয়াজআলহু লানা আজরাও ওয়া জুখরাও ওয়াজ আলহু লানা শাফিআও ওয়া মুশাফ্ ফাআন।

মৃত ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকা হলে পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرْطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَدُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُسَفِّعَةً

(উচ্চারণ: ‘আল্লাহ্ মাফআলহা লানা ফরাতীও ওয়াজ আলহা লানা আজরাও ওয়া জুখরাও ওয়াজআলহা লানা শাফিআতাও ওয়া মুশাফ্ফাআহ।)

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় পড়বে :

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ

(উচ্চারণ: বিসিমিল্লাহি ওয়াআলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহি।)

কবরের ওপর মাটি দেওয়ার সময় পড়বে:

وَمِنَهَا خَلَقْنَاكُمْ وَأَوَّلُهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

(উচ্চারণ: মিনহা খালাকনাকুম ওয়াফিহা নুইদুকুম ওয়ামিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা।) (সূরা তা-হা আয়াত ৫৫)

এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের জানাবার উপস্থিতি হওয়া অন্যতম কর্তব্য। ভোগবিলাসে মত্ত উঁচু শ্রেণির মানুষ এবং সহায় স্বল্পদীন দরিদ্র মানুষ উভয়কে একইভাবে সাদা কাপড়ে, খালি হাতে পক্সারের যাত্রী হতে হবে-এ সালাত সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। কণিকের জীবন অন্যতমরূপে কাটিয়ে ইমানসহ কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া সবার একান্ত কর্তব্য।

দলীর কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে জানাবার সালাতের পুরুত্ব নিয়ে শ্রেণিতে আলোচনা করবে।

বাড়ির কাজ : জানাবার সালাত আদায়ের নিয়ম বর্ণনা কর।

পাঠ - ৫

সালাতুত তারাবিহ (صَلَاةُ التَّارَاجِ)

রমযান মাসে ইশার সালাতের পর বিতরের পূর্বে যে সালাত আদায় করতে হয়, তাকে সালাতুত তারাবিহ বা তারাবিহের সালাত বলে। এ সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। নবি করিম (স.) নিজে এ সালাত আদায় করেছেন ও সাহাবিগণকে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। সুন্নাত সালাত জামাআতে আদায়ের বিধান নেই। তবে তারাবিহের সালাত জামাআতে আদায় করা সুন্নাত। এ সালাত মোট বিশ রাকআত।

তারাবির সালাত আদায়ের নিয়ম

রমযান মাসে ইশার ফরয ও দুই রাকআত সুন্নাতের পর বিতরের পূর্বে তারাবিহের নিয়তে দুই রাকআত করে মোট বিশ রাকআত সালাত আদায় করতে হয়। প্রতি চার রাকআত অন্তর বসে বিশ্রাম নিতে হয়। তখন বিভিন্ন তাসবিহ পড়া যায়। নিম্নের দোয়াটিও পড়া যায়-

سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهُبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبَرِيَّاتِ وَالْجَبَرُوتِ - سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَتَأَمَّرُ وَلَا يَخْشَوْهُ أَحَدٌ أَبَدًا - سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَكُوتِ وَالرُّوْحِ -

(উচ্চারণ: সুবহানযিল মুলকি ওয়াল মালুকুতি সুবহানযিল ইযযাতি ওয়াল আজযাতি ওয়াল হায়যাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়ায়ে ওয়ালজাবারুতে। সুবহানাল মালিকিল হাইয়্যাদ্দি লাইহানায় ওয়ালইয়ামুহু আবাদান আবাদ। সুকুদুন কুদুসুন রাকুনা ওয়ারাকুনা মালাইকতি ওয়াল রুহ।)

তারাবিহের সালাত শেষ করে বিতরের সালাত রমযান মাসে জামাআতে আদায় করার বিধান রয়েছে।

তারাবির সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত

পবিত্র রমযান মাস রহমতের ও বরকতের মাস। পাপ থেকে মুক্তি পাবার শ্রেষ্ঠ সময় হলো রমযান মাস। সারা দিন সাওম (রোযা) পালনের পর বান্দা যখন ক্রান্ত শরীয়ে তারাবিহের বিশ রাকআত সালাত আদায় করে আত্মাহর দরবারে কল্লাকাটি করে, তখন আত্মাহ সে বান্দার প্রতি খুবই সজুট হন। বান্দার জন্য এমন সুযোগ বছরে মাত্র একবারই আসে। তাই আত্মাহর প্রিয় বান্দাগণ এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আত্মাহর রহমত পেতে ত্রুতী হন। এ প্রসঙ্গে নবি করিম (স.) বলেন: 'যে ব্যক্তি ইমানের সাথে অবিব্রাতে প্রতিদিনের আশায় রমযানের রাতে তারাবিহের সালাত আদায় করবে, আত্মাহ তাআলা তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।' (বুখারি)। তারাবিহের সালাত ছোট ছোট সূরার মাধ্যমে আদায় করা যায়। আবার কুরআন রহমতের মাধ্যমেও আদায় করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে যে, সূরাগুলে স্পষ্ট, যীরসিখর ও ছন্দের সাথে পড়তে হবে। রমযান মাসে তারাবিহের সালাত একত্রিত হয়ে জামাআতে আদায় করা উত্তম। এতে নামাযে ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। পূর্ণ একটি মাস পরস্পরের সাথে দেখা-সাকাত ও মত বিনিময়ের ফলে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, মমত্ববোধ, সম্মতি ও সৌহার্দ গড়ে ওঠে।

দলীর কাজ : 'তারাবিহের নামায জামাআতে আদায় করলে ভুল কম হয়।' এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

পাঠ-৬

সালাতুত তাহাজ্জুদ (صَلَاةُ التَّحَجُّدِ)

'তাহাজ্জুদ' আরবি শব্দ। এর অর্থ রাত জাগা, ঘুম থেকে ওঠা। মধ্যরাতের পর ঘুম থেকে ওঠে যে সালাত আদায় করতে হয়, তাকে তাহাজ্জুদের সালাত বলে। তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা সন্নাত। এর গুরুত্ব অপরিসীম। নবি করিম (স.) প্রতিনিয়ত এ সালাত আদায় করতেন এবং সাহাবিগণকেও আদায়ের জন্য উৎসাহিত করতেন। মহানবি (স.)-এর ওপর তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের জন্য বিশেষ তাগিদ ছিল। মহান আত্মাহ বলেন,

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ لَهُمْ تَأْفِيلَةً لَكَ

অর্থ : 'রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করুন। এ সালাত আপনাদের জন্য অতিরিক্ত।' (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৯৯)

কোনো কারণে তাহাজ্জুদের সালাত ছুটে গেলে মহানবি (স.) দুপুরের আগেই কাযা করে নিতেন।

গুরুত্ব

গভীর রাতে আরামের ঘুম ত্যাগ করে বান্দা যখন আত্মাহর নৈকট্য ও রহমত পাবার আশায় তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে, তখন আত্মাহ খুবই খুশি হন। তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে বান্দার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। এ সালাত আদায়ে পুণ্যময় জীবনের পথ প্রদর্শন হয়। আত্মাহ তাআলা এ সালাত আদায়কারীর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

'তারা শয্যা ত্যাগ করে, তাঁদের প্রতিপালককে আশায় ও ভয়ে ভয়ে ডাকে এবং তাঁদেরকে যে রিমিক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাঁদের জন্যে নয়নাভিরাম কী সৃষ্টিয়াত রাখা হয়েছে, তাঁদের কৃতকার্যের পুস্কার স্বপ্ন।' (সূরা আস সাজ্জাদাহঃ ১৬, ১৭)। তাহাজ্জুদ সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন: 'ফরয সালাতের পর সবচেয়ে উচ্চতম হলো তাহাজ্জুদের সালাত।' (মুসলিম)

প্রত্যেক মুমিনের উচিত তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হওয়া। তাহলেই আল্লাহ তার বান্দার ওপর সজ্জ্বী থাকবেন।

তাহাজ্জুদের সময় ও আদায়ের নিয়ম

রাতের শেষার্ধ্বে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা উত্তম। এ সালাত পড়া সূন্নাত।

এ সালাত দুই রাকআত করে সূন্নাত সালাতের নিয়মে আদায় করতে হয়। তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে কয়েকবার দরুদ পাঠ করা ভালো। এরপর বিতরের সালাত আদায় করা উত্তম।

দশীয় কাজ : ‘তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে।’ এ নিয়ে শিক্ষার্থীগণ দলে আলোচনা করবে।

পাঠ-৭

সালাতুল ইশরাক (صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ)

ইশরাকের সালাত সূন্নাতে যায়িদা বা নফল। এ নামাযে রয়েছে অনেক ফযিলত। হাদিস শরীফে এর ফযিলত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে। এতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। ইশরাকের সালাত দুই রাকআত করে ৪, ৬, ৮ রাকআত পর্যন্ত পড়া যায়। ইশরাকের সালাতকে হাদিসে যুহর সালাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সময়

ইশরাকের সালাত ফজরের পরে আদায় করতে হয়। ফজরের সালাত আদায় করে বিছানাতে বসে কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ, তাহলিল ও দরুদ পাঠের অবস্থায় থাকা এবং এ সময়ে কথাবার্তা বা কাজকর্ম না করাই উত্তম। সূর্য সম্পূর্ণরূপে উঠে গেলে এ সালাত আদায় করতে হয়। যদি কেউ ফজরের সালাতের পর দুনিয়ার কোনো আবশ্যকীয় কাজকর্ম করে এ সালাত আদায় করে, তবে তাও আদায় হবে। তবে সাওয়াব কম হবে।

আমরা আল্লাহর নৈকট্য ও অধিক পুণ্য লাভের আশায় এ সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হব।

সালাতুল আওয়াযিন (صَلَاةُ الْاَوَازِیْنِ)

এ সালাতও সূন্নাতে যায়িদা। হাদিসে আওয়াযিন সালাতের অনেক ফযিলত বর্ণিত আছে। এ সালাত নিয়মিত আদায় করলে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়।

সময় ও আদায়ের নিয়ম

আওয়াযিনের সালাত মাসরিবের ফরয ও দুই রাকআত সূন্নাতের পর থেকে ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায়। আওয়াযিনের সালাত দুই রাকআত করে হয় রাকআত পড়তে হয়। আমরা অধিক সাওয়াবের আশায় এ সূন্নাত সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হব।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা ইশরাক ও আওয়ারিন সালাতের সময় ও রাকআত সংখ্যা ছক আকারে পোস্টারে লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সালাতের নৈতিক শিক্ষা

সালাত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত ও কল্যাণপ্রসূ উপহার। ইহা মানুষকে সকল পাপাচার, অশ্লীলতা ও দুনিয়ার কলসংঘারী ভোগ-বিলাসের অশ্বমোহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখে। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط

অর্থ : 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

সালাত এক বড় নিয়ন্ত্রক শক্তি। প্রকৃত সালাত আদায়কারী মসজিদের বাইরে কোলাহল এবং দুর্বোধপূর্ণ মুহূর্তেও কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে না। সালাত মূলত বান্দার প্রতিটি গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। দুর্বল মন কখনো শয়তানের প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে পড়লে বিবেক তাকে সুরণ করিয়ে দেয় যে কিছুক্ষণ পরেই তোমাকে মসজিদে গিয়ে মহান প্রভুর দরবারে সিজদাহ বা মাখানত অবস্থায় উপস্থিত হতে হবে।

অপর্যবসায়ী করে তুমি কীভাবে সে দরবারে উপস্থিত হবে? এ ভাবনা তার মনে প্রবল হয়ে ওঠলে সে আর অন্যায় পথে পাবার চেষ্টা করে না। শয়তানি প্রলোভন হতে রক্ষা পায় এবং পুণ্যের পথে ফিরে আসে। প্রত্যেক মুসলমান যদি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতে আদায় করে, তাহলে অবশ্যই তাদের নৈতিকতার উন্নতি হবে। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি বা অনিয়মের আশ্রয় নিবে না। বরং তারা হয়ে উঠবে এ জাতির আদর্শ মানবসম্পদ।

দলীয় কাজ : 'সালাতের নৈতিক শিক্ষা একজন মানুষকে কর্তব্যপারায়ণ করে তোলে'।
এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে আলোচনা করবে।

সালাতের সামাজিক শিক্ষা

জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার সামাজিক গুরুত্ব অনেক। ইমামের পেছনে সালাত আদায়ের অর্থ নেতার অনুসরণ। জামাআতে সালাত আদায়ের ফলে মানুষ মানুষে ভেদাভেদ থাকে না। রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব, ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত একই সারিতে দাঁড়ায়। এতে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের প্রতিফলন ঘটে। দৈনিক পাঁচবার জামাআতে সালাত আদায় করলে পরস্পরের বোঝাখবর নেওয়া যায়, বিপদপদে একে অপরের সাহায্য করা সম্ভব হয় এবং আত্মতৃপ্তি দৃঢ় হয়। তারা সামাজিক দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট হয়। এরূপ ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের অত্যন্ত দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে, তারা জাতির অমূল্য মানবসম্পদে পরিণত হয়।

দায়িত্বশীল পদে নিয়োজিত ব্যক্তিকে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। আর সালাতই হচ্ছে এর উত্তম প্রশিক্ষণ।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বসে পরস্পর আলোচনা করে সালাতের সামাজিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ-৮ সাওম (الصَّوْمُ)

সাওমের ধারণা

‘সাওম’ আরবি শব্দ। এর অর্থ বিরত থাকা। শরিয়তের পরিভাষায় সুবুহি সাদিক থেকে সুর্য়াত পর্যন্ত নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোযা বলে। রমযান মাসের রোযা পালন করা মুসলমানের ওপর ফরয। যে তা অস্বীকার করবে সে কাফির হবে। বস্তুত রোযা পালনের বিধান পূর্ববর্তী সকল উম্মতের জন্য অশরিহার্য ইবাদত ছিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ৪

অর্থ : ‘হে ইমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হলো, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।’ (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৩)

রোযা পালন করলে মানুষ পরস্পর সহসুভূতিশীল হয়। ধনীরা গরিবের অনাহারে, অর্ধাহারে জীবনযাপনের কষ্ট অনুধাবন করতে পারে। ফলে তারা দান-খরচাতে উৎসাহিত হয়। রোযা পালনের মাধ্যমে মানুষ হিসে, বিষে, পরনিদ্রা, ধূমপানে আসক্তি ইত্যাদি বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে। হাদিসে বর্ণিত আছে:

الصِّيَامُ جُنَّةٌ

অর্থ : ‘রোযা হচ্ছে ঢালঝরূপ’ (বুখারি)

কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আত্মরক্ষার হাতিয়ার হলো রোযা। রোযা পালনের মাধ্যমে পানাহারে নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস পড়ে ওঠে। এতে অনেক রোগ দূর হয়। স্বাস্থ্য ভালো থাকে। রোযার ফযিলত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন : ‘রমযান মাস, এতে মানুষের দিলারী এবং সংপথের স্পষ্ট নির্দেশ ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।’ (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৫)। এতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, রমযান মাসে কুরআন নাখিল হয়েছে বলে এটি অতি পবিত্র মাস। হাদিসে কুদসিতে আছে,

الصَّوْمُ لِي وَآكَاءُ جَزَائِي بِهِ

অর্থ : ‘রোযা কেবল আমারই জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।’ (বুখারি)। অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘জান্নাতের রাহিয়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন সিয়াম পালনকারী ব্যক্তীত অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না।’ (বুখারি)। রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং আখিরাতে সাওয়াবের আশায় সাওম পালন করে, তার অতীত জীবনের সকল (সগিরা) গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।’ (বুখারি ও মুসলিম)। এ মাস ঐশ্বের্যের মাস। আর ঐশ্বের্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। এ মাসে মুমিনের রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোনো রোযা পালনকারীকে ইফতার করাবে, সে তার রোযার সমান সাওয়াব পাবে। অথচ রোযা পালনকারী ব্যক্তির সাওয়াবে বিন্দুমাত্র ঘাটতি হবে না। ফযিলতের দিক দিয়ে রমযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশ রহমতের, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাতের এবং শেষ অংশ জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়ার।

সাওমের (রোযার) প্রকারভেদ

রোযা ছয় প্রকার। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, নফল ও মাকরুহ।

- ক. ফরয রোযা: বছরে শুধু রমযান মাসের রোযা পালন করা ফরয এবং এর অমীকারকারী কাফির। রমযানের রোযার কাযাও ফরয। বিনা ওযরে এ রোযা ত্যাগকারী ফাসিক ও গুনাহ্‌গার হবে।
- খ. ওয়াজিব রোযা: কোনো কারণে রোযা পালনের মানত করলে তা পালন করা ওয়াজিব। কোনো নির্দিষ্ট দিনে রোযা পালনের মানত করলে সেদিনেই পালন করা জরুরি।
- গ. সুন্নাত রোযা: রাসুলুল্লাহ (স.) যে সকল রোযা নিজে পালন করেছেন এবং অন্যদের পালন করতে উৎসাহিত করেছেন, সেগুলো সুন্নাত রোযা। আশুরা ও আরাফার দিনে রোযা পালন করা সুন্নাত।
- ঘ. মুস্তাহাব রোযা: চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা পালন করা মুস্তাহাব। সম্তাহের প্রতি সোম ও বুধসন্ধ্যার এবং শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা পালন করা মুস্তাহাব।
- ঙ. নফল রোযা: ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব ছাড়া সকল প্রকার রোযা নফল। যে সকল দিনে রোযা পালন করা মাকরুহ ও হারাম, ঐ সকল দিন ব্যতীত অন্য যেকোনো দিন রোযা রাখা নফল।
- চ. মাকরুহ রোযা: ১. মাকরুহ তাহরমি, যা কার্যত হারাম। যথা- দুই ঈদের দিনে ও ফিলহজ্জ মাসের চাঁদে ১১, ১২, ১৩ তারিখে রোযা পালন করা। ২. মাকরুহ তালবিহি, যেমন- মুহাররাম মাসের ৯ বা ১১ তারিখে রোযা পালন না করে শুধু ১০ তারিখে পালন করা।

দলীয় কাজ : সাওমের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ছক আকারে লিখে শ্রেণিতে প্রদর্শন করবে।

পাঠ-৯

সাহারি (السَّحَرِيُّ)

'সাহারি' আরবি শব্দ। যা সাহ্যরুন শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এর অর্থ ভোর, প্রভাত ইত্যাদি। রমযান মাসে রোযা পালনের উদ্দেশ্যে সুবহি সাদিকের পূর্বে যে খাবার খাওয়া হয়, তাকে সাহারি বলে। সাহারি খাওয়া সুন্নাত। রাসুলুল্লাহ (স.) নিজে সাহারি খেয়েছেন এবং অন্যদেরও খাওয়ার জন্য তাগিদ করতেন। মহানবি (স.) বলেছেন, 'সাহারি খাওয়া বরকতের কাজ। তোমরা সাহারি খাও।' (বুখারি)। সুবহি সাদিকের আগেই সাহারি খাওয়া শেষ করতে হবে। কিন্তু এত আগে সাহারি খাওয়া উচিত নয় যে, খাওয়ার পর অনেক সময় বাকি থাকে। ফলে অনেকে বিশ্রামের জন্য বিছানায় যায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। এতে সালাত কাযা হয়ে যায়।

ইফতার (الْإِفْطَارُ)

'ইফতার' আরবি শব্দ। এর অর্থ ভক্ত করা। ইসলামি পরিভাষায় সূর্যাস্তের পর নিয়তের সাথে হালাল বস্তু পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভক্ত করাকে ইফতার বলে। ইফতার করা সুন্নাত। এতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। ইফতার করার সময়

‘বিসমিত্বাহ’ বলে তলু করা এবং ‘আলহামদুস্তাহ’ বলে শেষ করা উত্তম। তবে নিম্নোক্ত সোয়াটিও পড়া যায়:

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ -

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আপনার জন্য সাওম পালন করেছি, আপনার উপরই নির্ভর করছি এবং আপনার দেওয়া রিযিক দ্বারা ইফতার করলাম।’ (আবু দাউদ)। নিজে ইফতার করার সাথে সাথে অন্যকেও ইফতার করালে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে সে রোযাদারের সমান সাওয়াব পাবে।’ (তিরমিযি)। অমরা অধিক সাওয়াব ও আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশায় নিজে ইফতার করব এবং অন্যকেও ইফতার করাব।

সাওম ভঙ্গের কারণ

যে সব কারণে সাওম ভঙ্গ হয় এবং একটির পরিবর্তে একটি সাওম পালন করা ফরয হয়, তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. তুলবশত : কিছু খেয়ে ফেলার পর সাওম ভঙ্গ হয়েছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে।
২. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় পানি পেটে গেলে।
৩. সাওম পালনকারীকে জোর করে কেউ কিছু পানাহার করালে।
৪. তুলবশত : রাত এখনি বাকি আছে মনে করে সুবিধি সাদিকের পর সাহুরি খেলে।
৫. ইফতারের সময় হয়েছে মনে করে সূর্যাস্তের আগে ইফতার করলে।
৬. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভর্তি বমি করলে।
৭. প্রশাব-পায়খানার রাস্তার মাধ্যমে ঔষধ বা অন্য কিছু গ্রহণ করলে।

সাওম মাক্‌রুহ হওয়ার কারণ

সাওম মাক্‌রুহ হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। নিম্নে কতিপয় কারণ উল্লেখ করা হলো-

১. অন্যের পিবত অর্থাৎ দোষত্রুটি বর্ণনা করলে।
২. মিথ্যা কথা বললে, অশ্লীল আচরণ বা গালমন্দ করলে।
৩. কুলি করার সময় গড়গড়া করলে। কারণ এতে গলার ভেতর পানি ঢুকে গিয়ে রোযা ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে।
৪. যথাসময়ে ইফতার না করলে।
৫. গরমরোধে গারে ঠান্ডা কাপড় জড়িয়ে রাখলে বা বারবার কুলি করলে।

দলীল কাছ : শিকারীরা সাহুরি ও ইফতারের সময়সূচি ও সোয়া ছক অকারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সাওমের (রোযার) কাযা ও কাফফারা (قَضَاءُ الصَّوْمِ وَكَفَّارَتُهُ)

কাযা

কোনো কারণে অনিচ্ছায় যদি সাওম ভেঙে যায় কিংবা কোনো ওযরে তা পালন করা না হয়, তবে একটি সাওমের পরিবর্তে একটি সাওমই রাখতে হয়। একে কাযা সাওম বলে।

সাওম কাযা করার কারণসমূহ

১. সাওম পালনকারী রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে বা সফরে থাকলে অথবা অন্য কোনো ওযরের কারণে সাওম পালনে অপারগ হলে।
২. রাত মনে করে ভোরের পানাহার করলে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে।
৩. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখভর্তি বমি করলে।
৪. জোরপূর্বক সাওম পালনকারীকে কেউ পানাহার করালে।
৫. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় পানি পেটে গেলে।
৬. ভুলক্রমে কোনো কিছু খেতে শুধু করার পর সাওম নষ্ট হয়ে গেছে মনে করে পুনরায় খেলে।
৭. দাঁত হতে ছোলা পরিমাপ কোনো জিনিস বের করে খেলে।

উল্লিখিত অবস্থায় সাওম নষ্ট হলেও সারা দিন না খেয়ে থাকতে হয় এবং পরে কাযা করতে হয়।

কাফফারা (الْكَفَّارَةُ)

ইচ্ছাকৃতভাবে সাওম পালন না করলে বা সাওম রেখে বিনা কারণে ভেঙে ফেললে কাযা এবং কাফফারা উভয়ই ফরয হবে।

সাওমের কাফফারা নিম্নরূপ:

১. একাধারে দুই মাস সাওম পালন করা। ২. এতে অক্ষম হলে ৬০ জন মিসকিনকে পরিতৃপ্তির সাথে দুই বেলা খাওয়ানো অথবা ৩. একজন দাসকে স্বাধীনতা প্রদান করা।

একাধারে দুই মাস কাফফারার সাওম আদায়কালীন যদি মাসে দুই-একদিন বাদ পড়ে যায়, তবে পূর্বের সাওম বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় নতুন করে শুরু করে দুই মাস বিরতিহীন ভাবে সাওম পালন করতে হবে।

দলীল কাছ : শিক্ষার্থীরা সাওম কাযা ও কাফফারার কারণ পৃথকভাবে পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ-১০

ইতিকার (الْعِتْكَافُ)

‘ইতিকার’ আরবি শব্দ। এর অর্থ অবস্থান করা, আটকে থাকা। শরিয়তের পরিভাষায় সাংসারিক কাজকর্ম ও পরিবার থেকে আলাদা হয়ে মসজিদে ইবাদতের নিয়তে অবস্থান করাকে ইতিকার বলা হয়।

ইতিকার সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিয়সা। এলাকাবাসীর মধ্য থেকে একজন আদায় করলেই আদায় হয়ে বাবে। আর কেউ আদায় না করলে সকলেই দায়ী হবে। ইতিকারকারী দুনিয়ার কাজকর্ম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণভাবে আট্টাহর ইবাদতে মগ্ন হন। ফলে সে অনর্থক কথাবার্তা ও যাবতীয় পাপ থেকে বেঁচে থাকে। আট্টাহর সাথে মনের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। একত্রিংশে করেছে দিন ইবাদতের ফলে তার মনে আট্টাহর ভীতি গভীরভাবে সৃষ্টি হয়। ফলে দুনিয়ার চাকচিক্য তাকে আট্টাহর বিকর (স্মরণ) হতে দূরে সরিয়ে পুরে না। ইবাদতে তার মনে শান্তি আসে। ইতিকারের ফলিত অনেক। রাসুলুল্লাহ (স.) নিয়মিতভাবে প্রতিবছর ইতিকার করতেন। হাদিসে আছে, ‘রাসুলুল্লাহ (স.) প্রতি রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকার করতেন। এ আমল তাঁর ইতিকাল পর্যন্ত বহাল ছিল। মহানবি (স.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর বিবিগণও এ নিয়ম পালন করেন।’ (বুখারি)

রমযান মাসে লাইলাতুল কদর নামে একটি বরকতময় রাত আছে। যে রাত হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। রমযানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতে অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখে লাইলাতুল কদর বুজতে মহানবি (স.) নির্দেশ দিয়েছেন। এ সময় ইতিকার অবস্থায় থাকলে লাইলাতুল কদর লাভের সৌভাগ্য হতে পারে।

আদায়ের নিয়ম

রমযানের শেষ দশ দিনে ইতিকার করা সুন্নাহ। এর সর্বনিম্ন সময় একদিন একরাত। রমযান মাস ছাড়াও মুস্তাহাব ইতিকার যেকোনো সময় পালন করা যায়। সত্বীলোক নিজ ঘরে নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকার করতে পারেন।

দলীল কাছ : ‘ইতিকারের মাধ্যমে লাইলাতুল কদর পাওয়া সম্ভব।’ দলে বিভক্ত হয়ে এ নিয়ে আলোচনা আয়োজন করবে।

সাদাকাতুল ফিতর (صَدَقَةُ الْفِطْرِ)

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে হওয়ারা হওয়ার পূর্বে সাওমের ক্রটি-বিচ্ছাদি সংশোধন ও আট্টাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে গরিব-দুখীদের সহযোগিতায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সম্পদ দান করা হয়, তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলে।

মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ (সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্য বা সমপরিমাণ অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকলে তাকে নিসাব বলে) সম্পদের মালিক প্রত্যেক স্বাধীন মুসলিম নর নারীর ওপর ‘সাদাকাতুল ফিতর’ ওয়াজিব। শিশু ও পরাধীন (গোলাম) ব্যক্তির সাদাকা অতিভাবক আদায় করবে।

তাৎপর্য

যে বছর রোযা ফরয হয়, সে বছরই রাসুলুল্লাহ (স.) মুসলমানদের সাদাকারে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দেন।

মুসলমানগণ পবিত্র রমযান মাসে রোযা পালন করে। আত্মাহুতাওয়ার ইবাদতে মশগুল থাকে। এসব দায়িত্ব পালনে অনেক সময় ভুলত্রুটি হয়ে যায়। রোযা পালনে যেসব ত্রুটি-বিঘটিত হয়, তার কতিপয়গুলির জন্য শরিয়তে রমযানের শেষে 'সাদাকাতুল ফিতর', ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। ফিতর শেলে গরিব-অনাথ লোকেরাও ঈদের খুশিতে অংশীদার হতে পারে। এভাবেই ধনী-গরিবের মধ্যে ব্যবধান কমে আসে এবং সম্প্রীতি ও সৌহার্দ গড়ে ওঠে। হাদিসে আছে, 'সাদাকাতুল ফিতর' দ্বারা সাওম পালনের সকল দোষত্রুটি দূরীভূত হয়, গরিবের পানাহারের ব্যবস্থা হয়।' (অবু দাউদ)।

আদায়ের নিয়ম

ঈদের সালাতের পূর্বে নিসাব পরিমাণ মালের মালিকের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়। ঈদের দুই একদিন আগে 'সাদাকাতুল ফিতর', আদায় করা যায়। তবে ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে ঈদের মাঠে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় করা উত্তম। ঈদের পর কেউ ইহা অদায় করলে আদায় হবে কিন্তু সাওয়াব কম হবে।

সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ

মাথাপিছু নিসফু সা অর্থাৎ প্রায় পৌনে দুই কেজি গম বা যব বা তার মূল্য আদায় করতে হবে।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায়ের গুরুত্ব ও পর দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

পাঠ - ১১

সাওমের (রোযার) নৈতিক শিক্ষা

সাওম (রোযা) পালনের মাধ্যমে বান্দা একদিকে আত্মাহুতার নির্দেশ পালন করে, অপরদিকে তার নৈতিকতারও বিশেষ উন্নয়ন ঘটায়। সাওমের অনেক নৈতিক শিক্ষার মধ্যে কতিপয় শিক্ষা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. সংযম

মানুষের মধ্যে যেমন ভালো গুণ থাকে, তেমনি তার মধ্যে জৈবিক ও পাশবিক শক্তিও থাকে। পাশবিক শক্তি তাকে বেজ্ঞাচারিতার পথে পরিচালিত করে। বেজ্ঞাচারিতার কারণে সমাজে অমান্যতা, কোন্দল, কলহ ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে শক্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের শ্বীয় প্রবৃত্তিকে সংযমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। রোযা মানুষকে এই সংযম শিক্ষা দেয়। মানুষের কুপ্রবৃত্তি তাকে তার খেয়ালখুশি মতো চলতে এবং সকল প্রকার অন্যায় কাজ করতে উৎসাহ দেয়। রমযানের সাওম এই অবাধ স্বাধীনতা ও বেজ্ঞাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৈধ পানাহার ও অন্যান্য জৈবিক চাহিদা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। এই সাওম চরম খাদ্যবিলাসী ও বেজ্ঞাচারিতাকে সংযমী করে তোলে। পূর্ণ এক মাস এই সংযম মেনে চলার প্রশিক্ষণ তাকে পোটা বছর সংযমী হয়ে চলতে সাহায্য করে।

দলীয় কাজ : 'মানুষের কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রোযার সংযম শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা রাখে।' শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা করবে।

২. সহমর্মিতা

যে ব্যক্তি কখনো অন্যায়ের থাকেনি, সে কীভাবে ক্ষুধার ক্লাপা অনুভব করবে? আর যে কখনো রোগাক্রান্ত হয় নি, সে কীভাবে রোগযন্ত্রণা অনুভব করবে? কোনো অকৃত্রিম পিপাসার্ত ভিক্ষুক বিত্তশালীদের দ্বারে উপস্থিত হয়ে যেন বিদ্রূপের শিকার না হয় - এটা রোযার অন্যতম শিক্ষা (অর্থাৎ অসহায় ক্ষুধার্তের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া ও সাওমের শিক্ষা)। ধনী-গরিব, রাজা-শ্রমী, সকল মুমিন বান্দা সুবৃহি সামিক থেকে সুবিস্ত পৰ্বন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুধার ক্লাপা বুঝতে পারে। গ্রীষ্মকালে দিন বড় হয়, আবহাওয়া গ্রীষ্ম গরম থাকে, তখন ধনীর দুলাল হোক আর গরিবের সন্তান হোক ক্ষুধার ক্লাপা ও পিপাসার কাতরতা সমভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। একইভাবে রোযাদার ব্যক্তির দ্বারে যখনই কোনো অন্যায়ী অকৃত্রিম মানুষ আসবে, তখন অবশ্যই তার মনে দয়া বা সহমর্মিতা সৃষ্টি হবে। ধনী ও গরিবের মধ্যে আন্তরিকতা, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা সাওম পালনের মাধ্যমে হতটা বৃদ্ধি পায়, অন্য কোনো ইবাদতের মাধ্যমে এগুলো এত বেশি সৃষ্টি হয় না।

এই উপলব্ধির বাস্তবতা পরীক্ষার জন্য রোযাদার ব্যক্তিকে ইচ্ছার করানোর ওপর পুরোপুরি করা হয়েছে। একজন রোযাদার অপরকে ইচ্ছার করানোর মানেই হচ্ছে সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ।

বাড়ির কাজ : 'গরিবের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে সাওমের সহমর্মিতা শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা রাখে' ব্যাখ্যা কর।

৩. সহিষ্ণুতা

সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য মুমিনের জন্য এক বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতিগতভাবে মানুষের অন্তর থাকে অস্থির ও চঞ্চল। যদি কোনো প্রাণী তার আওতার মধ্যে থাকে, তবে তা পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মনের এ অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে নিজ ইচ্ছামতো কাজ করলে সমাজে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে। একমাত্র সহিষ্ণুতা মাধ্যমে মনের কু-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনই এ ধৈর্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। রোযা পালনকারী দিনের বেলায় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কিছু পানাহার করে না ও অন্যায় কাজ করে না। এমনকি জৈবিক চাহিদাটুকুও দমন করে রাখে। এটি ধৈর্যের এক অনুশ্রম দৃষ্টান্ত। কেউ যদি অত্যন্ত অনটনের কারণে আহারাঙ্গি সত্ত্বেই অপারগ হয়, তবে রোযার মাধ্যমে অর্জিত ধৈর্যই হতে পারে তার একমাত্র অবলম্বন। এতে একদিকে যেমন রক্ষা হয় ইমান, তেমনি অপরদিকে শান্ত হয় পরিবার ও সমাজ।

বাড়ির কাজ : ইবাদত অধ্যায়ের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরবর্তী জীবনে কীভাবে কাজে লাগবে তার একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টার পেপারে লিখবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ

১. জামাআতে সালাত আদায় ঐক্যের প্রতিফলন ঘটায়।
২. মুসাফিরের জন্য নামায আদায় করার অনুমতি আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ অনুগ্রহ।
৩. দুগুণ ব্যক্তিকে থাকা পবিত্র সময়ের মধ্যেই নামায আদায় করতে হবে।
৪. বিলহজ্জ মাসের তারিখ যে উষসব পালন করে থাকে, তাকে ইদুল আহহা বলে।
৫. তারাবিহের নামায আদায় সূন্নাতে।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. জুমার নামায	রমযান মাসে পাওয়া যায়
২. বেইশ ব্যক্তির	তাকওয়া অর্জন
৩. লাইলাতুল কদর	মসজিদে পড়তে হয়
৪. রোযার মূল উদ্দেশ্য	কাযা করতে হয়
৫. অনিচ্ছায় রোযা ভাঙলে	নামায কাযা করতে হয় না

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জামাআতের সালাতে ইমামের কর্তব্য সম্পর্কে লিখ।
২. ইদের দিনের সূন্নাত কাজগুলো কী লিখ।
৩. রোযার কাফ্যারার বর্ণনা দাও।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মাসবুকের সালাত বলতে কী বোঝায়? মাসবুকের সালাত আদায়ের নিয়ম লিখ।
২. মুসাফিরের সালাতের নিয়ম লিখ।
৩. দুগুণ ব্যক্তির সালাত আদায়ের নিয়ম লিখ।
৪. 'নৈতিকতা অর্জনে সাওমের গুরুত্ব অপরিসীম'-ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মানুষকে সংযম শিক্ষা দেয় কোন ইবাদত?

ক. সালাত	খ. যাকাত
গ. সাওম	ঘ. হজ্জ।

২. 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায়ের মাধ্যমে -

- i. সাওম পালনের সকল দোষত্রুটি দূরীকৃত হয়
- ii. ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়
- iii. পরিবার পানাহারের ব্যবস্থা হয়

কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ধনাঢ্য ব্যক্তি রহিম সাহেব সাহারি খেয়ে বখারীতি সাওম শুরুর করলেন। দুপুরে প্রচণ্ড গরম পড়তে ইচ্ছা করে ভাত খেয়ে নিলেন। পরবর্তীতে তিনি কাবা হিসেবে একটি ঘোষা আদায় করলেন।

৩. রহিম সাহেবের কাজের মাধ্যমে লক্ষিত হয়েছে-

- | | |
|------------|------------|
| ক. ফরয | খ. ওয়াজিব |
| গ. সুন্নাত | ঘ. নফল। |

৪. উপর্যুক্ত কারণে রহিম সাহেবকে-

- i. কাবা করতে হবে
- ii. কাফফারা আদায় করতে হবে
- iii. একমাসে এক মাস সাওম আদায় করতে হবে

কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। সুলাতান মিয়া একজন কৃষক। সারাদিন তিনি মাঠেই কাজ করেন। নামাযের সময় হলে ক্ষেতের পাশে কাপড় বিছিয়ে নামায আদায় করেন। জুমার দিনে মসজিদে না গিয়ে বুহরের সালাত আদায় করেন। তার প্রতিবেশী হারুন তাকে বলল, 'জুমার নামায' জামাআত ব্যতীত আদায় হয় না। আমি মসজিদে যাচ্ছি। তুমিও আমার সাথে চলে। তখন সুলাতান বলে, 'মসজিদ অনেক দূরে। কাজের ক্ষতি হবে বলেই ক্ষেতের পাশে বুহর নামায আদায় করছি।'

- ক. 'জুমার সালাত' কৌনদিন আদায় করতে হয়?
- খ. মুসাফির বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
- গ. জুমার নামাযের ব্যাপারে সুলতান মিয়াব মনোভাবে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. হাবুন মিয়াব বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন

২। আসলাম ও আসগর সপ্তম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র। ২য় সাময়িক পরীক্ষার সময় রমযান মাস থাকায় পরীক্ষা খারাপ হওয়ার কথা ভেবে আসলাম রোযা ছেড়ে দেয়। মাঝেমধ্যে সালাত আদায়েও সে গাফলতি করে। অন্যদিকে কষ্টকর হলেও আসগর নিয়মিত রোযা পালন করে। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে ওরাক্ত হলেই নামায আদায় করে নেয়। পিতার সাথে মাঝে মাঝে তাহাজ্জদের নামাযও আদায় শেষে ভালো ফলাফলের জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করে। আসগর আসলামকে নিয়মিত সালাত ও সাওম পালনের ব্যাপারে বললে আসলাম বলে, এই মুহুর্তে পরীক্ষায় ভালো ফলাফলই আমার নিকট মুখ্য। পরবর্তীতে আসগর তাঁদের ধর্মীয় শিক্ষককে আসলামের বক্তব্যটি জানালে তিনি বললেন, 'আসলাম তোমার কথা দ্বারা ইবাদতের প্রতি অবজ্ঞা বুঝাচ্ছে যা ইবাদতকে অস্বীকার করারই শামিল।'

- ক. ঐর্থের বিনিময় কী?
- খ. সাদাকাতুল ফিতর বলতে কী বোঝায়?
- গ. আসলামের মনোভাবে কী প্রকাশ পেয়েছে? শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. আসগরের কাজের পরকালীন পরিণতি কুরআন-হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার পবিত্র বাণী। এটি মানবজাতির জন্য একটি বিশেষ নিদ্রামত। মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলা এটি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর নাযিল করেছেন। আর নবি করিম (স.) আমাদের নিকট এ পবিত্র বাণী পৌছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ নিজে আমল করে তিনি আমাদের হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি মানুষের নিকট এ বাণীর মর্ম ও তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর এ সমস্ত বাণী ও কর্মকে বলা হয় হাদিস। হাদিস আল-কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। ইসলামি বিধি বিধান পূর্ণরূপে পালন করার জন্য আল-কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান লাভ করা আবশ্যিক।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- আল-কুরআনের পরিচয় ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আল-কুরআনের অবতরণ, সংরক্ষণ ও সংকলন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- মাদ্দ ও ওয়াফসহ তাজবিদ অনুযায়ী বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করতে পারব।
- আল-কুরআনের নির্বাচিত পাঁচটি সূরা অর্থসহ মুখস্থ করতে ও মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নির্বাচিত সূরাগুলোর পটভূমি (শানে নুহুল) ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।
- মুনাজাতমূলক (প্রার্থনামূলক) তিনটি আয়াত অর্থসহ বলতে পারব।
- হাদিসের গুরুত্ব ও সিহাহ সিতার পরিচয় বর্ণনা করতে পারব।
- কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী নৈতিক জীবনযাপনের উপায় চিহ্নিত করতে পারব।
- মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিস অর্থসহ বলতে পারব।
- নৈতিক গুণাবলিবিষয়ক তিনটি হাদিস অর্থসহ বলতে পারব।
- হাদিসের আলোকে মানবশ্রেম ও পরমত সহিষ্ণুতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- হাদিসের আলোকে মানবশ্রেম ও পরমত সহিষ্ণুতামূলক আচরণগুলো চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ - ১

কুরআন মাজিদ

আল-কুরআন আত্মাহ তায়ালার পবিত্র বাণী। এটি মুসলিমগণের ধর্মগ্রন্থ। কুরআন মাজিদ বরকতময় গ্রন্থ। মানুষের প্রতি এটি আত্মাহ তা'আলার একটি বিশেষ নিয়ামত। আত্মাহ তা'আলা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর সুদীর্ঘ ২৩ বছরে এটি নাখিল করেন। আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে এটি সর্বশেষে নাখিল করা হয়েছে। এরপর আর কোনো কিতাব আসেনি। আর ভবিষ্যতেও আসবে না। কিতামত পূর্বত এ কিতাবের বিধিবিধান ও শিক্ষা বলবৎ থাকবে। এটি সর্বকালের সকল মানুষের জন্য হেনায়াতের উৎস স্বরূপ। আল-কুরআনের নির্দেশনা মেনে চললে মানুষ দুনিয়াতে শান্তি ও সন্মান পাবে। আর আখিরাতে চিরশান্তির জ্ঞান লাভ করবে। আত্মাহ তা'আলা বলেন:



وَلَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ৪

অর্থ : 'এই কিতাব আমি নাখিল করেছি, যা কল্যাণময়। অতএব, তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।' (সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫৫)

অবতরণ

আত্মাহ তাআলা আল-কুরআন আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর নাখিল করেন। আল-কুরআন 'লাওহে মাহফুজ' বা সুরেকিত ফলকে লিপিবদ্ধ আছে। 'লাওহে মাহফুজ' অর্থ সুরেকিত ফলক। আত্মাহ তাআলা বলেন-

بَلْ مَوْحُونَ فِي نُوحٍ خُفُوفٍ ৪

অর্থ : 'রহিত : এটি সম্মানিত কুরআন। সুরেকিত ফলকে লিপিবদ্ধ।' (সূরা আল-বুরূজ, আয়াত ২১-২২)

লাওহে মাহফুজ থেকে আল-কুরআন প্রথমে কদরের রাতে প্রথম আসমানের 'বায়তুল ইয়ুহা' নামক স্থানে একসাথে অবতীর্ণ হয়। এটি ছিল রমযান মাসের লাইলাতুল কদর বা মহিমাবিত রাত। আমরা এ রাতকে শবে কদর বলে থাকি। এরপর প্রথম আসমান থেকে অল্প অল্প করে পুরো কুরআন মাজিদ প্রিয় নবি (স.)-এর ওপর নাখিল করা হয়।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। তিনি আরব দেশের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় গোটা আরব ছিল অজ্ঞতা ও বর্বরতায় আচ্ছন্ন। তারা নানা মূর্তির পূজা করত। নানাবিধ অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করত। ঐতিহাসিকগণ সে সময়কে 'আহিয়ামে জাহেলিয়া' নামে অভিযুক্ত করেছেন। আহিয়ামে জাহেলিয়া অর্থ অজ্ঞতার যুগ।

নবি করিম (স.) আরবদের এরূপ অজ্ঞতা ও বর্বরতা পছন্দ করতেন না। তিনি সব সময় সত্য ও সুন্দরের অনুসন্ধান করতেন। এ জন্য তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই তাঁর নিকট সর্বপ্রথম কুরআনের বাণী নাখিল হয়। তিনি সত্যের সন্ধান পান। তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। আত্মাহ তাআলা তাঁকে শেষ নবি ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করেন। এসময় মহান আত্মাহর নির্দেশে হযরত জিবরাইল (আ.) সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করেন। এটিই ছিল সর্বপ্রথম ওহি। এরপর মহানবি (স.) আরও ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর

জীবদ্দশায় আদ্বাহ তাআলা প্রয়োজন অনুসারে আল-কুরআনের বিভিন্ন অংশ অল্প অল্প করে নাযিল করেন। এভাবে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে আল-কুরআন সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হয়।

আল-কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব

আল-কুরআন মহান আদ্বাহর বাণী। এটি সংরক্ষণ করার দায়িত্বও তাঁরই। তিনি স্বয়ং আল-কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আদ্বাহ তাআলা বলেছেন-

إِنِّ عَلَىٰ بَيْنَا جَمْعَهُ وَفُرْأَهُ ۝

অর্থ: 'নিশ্চয়ই এর (আল-কুরআন) সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।' (সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত ১৭)

আদ্বাহ আরও বলেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِظُونَ ۝

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।' (সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯)

আল-কুরআনের সংরক্ষক স্বয়ং মহান আদ্বাহ। এ জন্য আজ পর্যন্ত এটির কোনোরূপ পরিবর্তন হয়নি। আর ভবিষ্যতেও হবে না। এটি সকল প্রকার পরিবর্তন হতে মুক্ত। কেউ এতে নতুন কোনো কিছু সংযোজন করতে পারে না। আবার এর থেকে কোনো কিছু বাণ্ড দিতে পারে না। আল-কুরআনের প্রতিটি হরকত, নুকতা, শব্দ, বাক্য সবকিছুই অপরিবর্তিত।

আল-কুরআন সংরক্ষণ

আল-কুরআন সর্বপ্রথম হিফয করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। হিফয হলো মুখস্থ করা। বারা পবিত্র কুরআন হিফয করেন তাঁদেরকে বলা হয় হাফিয। আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তারা খুব সহজেই নানা জিনিস স্মরণ রাখতে পারত। সম্প্রদত্ত আল-কুরআন মুখস্থ করার জন্যই আদ্বাহ তাআলা তাঁদের এবুল স্মৃতিশক্তি দান করছিলেন। কুরআন মাজিদের কোনো অংশ নাযিল হলে সর্বপ্রথম মহানবি (স.) তা নিজে মুখস্থ করে নিতেন। এরপর তা সাহাবিগণকে মুখস্থ করতে বলতেন। মহানবি (স.)-এর উৎসাহ ও নির্দেশে সাহাবিগণ আল-কুরআন মুখস্থ করে রাখতেন। এভাবে কুরআন মাজিদ স্মৃতিগটে সংরক্ষণ করা হয়।

আল-কুরআন লেখনীর মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা হয়। কুরআনের কোনো অংশ নাযিল হলে তা মুখস্থ করার পাশাপাশি লিখে রাখার জন্যও নবি করিম (স.) নির্দেশ দিতেন। যে সকল সাহাবি লিখতে জানতেন তাঁরা এ দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁদের বলা হয় কাতেবে ওহি বা ওহি লেখক। এঁদের সংখ্যা ছিল ৪২ জন। প্রধান ওহি লেখক সাহাবি ছিলেন হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা.)। ওহি লেখক সাহাবিগণ সর্বদা নবি (স.)-এর সাথে থাকতেন। কুরআনের কোনো অংশ নাযিল হলে তাঁরা সাথে সাথেই তা লিখে রাখতেন। সে সময় আজকের ন্যায় কাগজ কিংবা কম্পিউটার ছিল না। তাই তখন কুরআন মাজিদ বেজুর গাছের ডাল, পশুর হাড়, চামড়া, ছোট ছোট পাথর ইত্যাদিতে লিখে রাখা হতো। এভাবেও কুরআন মাজিদ সংরক্ষণ করা হয়।

আল-কুরআন সংকলন

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবদ্দশায় আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়। ফলে সে সময় গ্রন্থাকারে তা সংকলন করা হয়নি। বরং সেসময় হিফয ও লেখনীর সাহায্যে আল-কুরআনকে সংরক্ষণ করা হয়। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ইত্তিকালের পর আল-কুরআন সংকলন করা হয়।

মহানবি (স.)-এর ইত্তিকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলামের প্রথম খলিফা মনোনীত হন। সে সময় কতিপয় ভণ্ড নবির আবির্ভাব ঘটে। হযরত আবু বকর (রা.) সেসব ভণ্ড নবির বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেন। এ রকমই একটি যুদ্ধ ছিল ইয়ামামার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ভণ্ডনবি মুসারলামা কাম্বাবেবের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ করেন। তবে কুরআনের বহুসংখ্যক হাফিয শাহাদত বরণ করেন। এ অবস্থা দেখে হযরত উমর (রা.) ভাবলেন- কুরআনের হাফিযগণ এভাবে ইত্তিকাল করলে এর অনেক অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে কুরআন সংকলন করার পরামর্শ দেন। হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শ শ্রুতি হযরত আবু বকর (রা.) কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন। তিনি প্রধান ওহি লেখক সাহাবি হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)-কে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশে হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) সাহাবিদের নিকট সংরক্ষিত কুরআনের লিখিত অংশগুলো একত্র করেন। পাশাপাশি তিনি কুরআনের হাফিযগণের সাহায্যও গ্রহণ করেন। কুরআনের প্রতিটি অংশ তিনি লেখনী ও মুখস্থ এ উভয় পদ্ধতির সাথে মিলিয়ে দেখেন। এভাবে তিনি সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে আল-কুরআনের প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। আল-কুরআনের এ কপিটি খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইত্তিকালের পর তা দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত থাকে। হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদতের পর এ কপিটি তাঁর মেয়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত থাকে।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। তাঁর সময়ে ইসলামি সাম্রাজ্য ছিল বিশাল-বিস্তৃত। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ও দেশে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল অগণিত। এ সময় বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআনের পাঠরীতি নিয়ে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়। এমনকি এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে নানা ঐনকের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় হযরত উসমান (রা.) বিশিষ্ট সাহাবিগণের সাথে পরামর্শ করে আল-কুরআনের একক ও প্রামাণ্য পাঠরীতি প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ জন্য তিনি হযরত যায়দ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপি থেকে আরও সাতটি অনুলিপি প্রস্তুত করেন। এরপর বিভিন্ন প্রদেশে আল-কুরআনের এক এক কপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে পবিত্র কুরআনের পাঠরীতি নিয়ে মুসলমানদের ঐনক্য দূর হয়। আল-কুরআন সংরক্ষণের এরূপ অসামান্য অবদানের জন্য হযরত উসমান (রা.)-কে জামিউল কুরআন বলা হয়। জামিউল কুরআন অর্থ কুরআন সংকলক বা কুরআন একত্রকারী।

দশীয় কাজ : এই পাঠ পড়ে কুরআন সংকলন সম্পর্কে শিক্ষার্থী কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে একটি সারসংক্ষেপ লিখবে।

পাঠ-২ তাজবিদ (تجوید)

তাজবিদ অর্থ বিদ। এর অর্থ সুন্দর করা, বিন্যস্ত করা, সুন্দর করে সাজানো ইত্যাদি। আর ইসলামি পরিভাষায় আল-কুরআনকে সুশ্রুতাবে সুন্দর করে পাঠ করার কাজে তাজবিদ বলা হয়। কুরআন মাজিদ পড়ার বেশ কিছু নিয়মকানুন রয়েছে।

যেমন: মাখরাজ, সিফাত, মাদ্দ, ওয়াক্ফ, পুন্যাহ ইত্যাদির নিয়ম সম্পর্কে অবগত হওয়া। এসব নিয়মকানুন সহকারে শৃঙ্খলপূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করাকেই তাজবিদ বলা হয়। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা মাখরাজ সম্পর্কে জেনে এসেছি। এ শ্রেণিতে আমরা তাজবিদের আরও কিছু নিয়মকানুন জানব।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত অনেক। এটি নফল ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত। কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ۖ

অর্থ: 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফও পাঠ করবে, সে একটি নেকি লাভ করবে। আর এ নেকির পরিমাণ হলো দশগুণ।' (তিরমিযি)

পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফ বা বর্ণ তিলাওয়াতের দশটি করে সাওয়াব লেখা হয়। যেমন-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম)-এর মধ্যে ১৯টি বর্ণ রয়েছে। কেউ যদি এটি তিলাওয়াত করে তবে সে (১৯×১০) = ১৯০টি নেকি লাভ করবে।

অন্য হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন, 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা কিয়ামতের দিন তা পাঠকারীদের গণ্ডে সুশরিফ করবে।' (মুসলিম)

কুরআন শৃঙ্খ ও সুন্দরভাবে তিলাওয়াতের মাধ্যমে তিলাওয়াতের এসব ফযিলত লাভ করা যায়। এ জন্য তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করা অত্যাৱশ্যক। তাজবিদ সহকারে কুরআন পড়া আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। তিনি বলেছেন-

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝

অর্থ: 'আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে ও সুশৃঙ্খলভাবে।' (সূরা আল-মুয়াম্মিল, আয়াত ৪)

তাজবিদ না জেনে কুরআন পাঠ করলে তা শৃঙ্খ হয় না। আর কুরআন পাঠ শৃঙ্খ না হলে নামায সঠিকভাবে আদায় হয় না। এরূপ তিলাওয়াতকারী কোনো সাওয়াবও লাভ করবে না।

সুতরাং আমরা শৃঙ্খ ও সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ করব। আর এ জন্য প্রথমেই তাজবিদ শিক্ষা করব। এরপর কুরআন পাঠের সময় এ নিয়মগুলোর অনুশীলন করব।

পাঠ - ৩

মাদ্দ (مَدٍّ)

মাদ্দ শব্দের অর্থ দীর্ঘ করা, লম্বা করা। তাজবিদের পরিভাষায় মাদ্দের হরফের তান দিকের হরফতমুত্ত হরফ লম্বা করে পড়াকে মাদ্দ বলা হয়। যেস, যবর ও শেগকে হরফত বলে।

মাদের হরফ মোট তিনটি। যথা- আলিফ, ওয়াও, ইয়া (১-৩)।

এ তিনটি হরফ নিম্নলিখিত অবস্থায় মাদের হরফ হিসেবে উচ্চারিত হয় :

ক। (আলিফ)-এর পূর্বের হরফে যবর (১) থাকলে। যেমন- ۱

খ. ও (ওয়াও)-এর ওপর জযম (২) এবং তার ডান পাশের হরফে শেন (২) থাকলে। যেমন- ۲

গ. ۳ (ইয়া)-এর ওপর জযম (২) এবং এর ডান পাশের অক্ষরে ঘের (৩) থাকলে। যেমন- ۴

উপর্যুক্ত তিনটি অবস্থায়- ১-৩-১ মাদের হরফ হিসেবে গণ্য হয়। ফলে এর পূর্বের অক্ষর একটু দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

প্রকারভেদ

মাদ্দ প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

১. মাদ্দে আসলি (মূল মাদ্দ)

২. মাদ্দে ফরঈ (শাখা মাদ্দ)

নিম্নে এ দুটির সযুক্তিত পরিচয় তুলে ধরা হলো :

১. মাদ্দে আসলি (মূল মাদ্দ)

মাদের হরফের ডানে বা পরে জযম (২), বা হামযা (৩) কিংবা তাশদীদ (৪) না থাকলে তাকে মাদ্দে আসলি বলে।

মাদ্দে আসলিকে মাদ্দে তাব্বীও বলা হয়। এরূপ মাদ্দে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

উদ্যাহা, একটি সোজা আঁতুলকে স্বাভাবিকভাবে বাকা করে হাতের তালুতে লাগাতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাকে এক আলিফ পরিমাণ সময় বলে।

মাদ্দে আসলির উদাহরণ : ۵

এ শব্দটিতে একসাথে মাদ্দে আসলির তিন ধরনের উদাহরণ রয়েছে। যেমন-

ক. ۶ এখানে ও (ওয়াও)-এর ওপর জযম (২) এবং তার পূর্বের হরফ ৩ (নুন)-এর ওপর শেন (২) রয়েছে।

খ. ۷ এখানে ۳ (ইয়া)-এর ওপর জযম (২) এবং এর পূর্বের হরফ ৮ (হা)-এর নিচে ঘের (৩) রয়েছে।

গ. ۸ এখানে ۱ (আলিফ)-এর পূর্বের হরফ ৮ (হা)-এর ওপর যবর (১) রয়েছে।

এ তিনটি ক্ষেত্রেই মাদের হরফ ৩-১-১ এর পূর্বে বা পরে জযম (২) বা, হামযা (৩) বা তাশদীদ (৪) নেই। সুতরাং এগুলো মাদ্দে আসলি। এরূপ অবস্থায় ৩-৮-৮ (নুন, হা, হা) অক্ষরকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

কুরআন মাজিদের যে সকল হরফের ওপর খাড়া যবর (১), নিচে খাড়া ঘের (৩) এবং ওপরে উল্টো শেন (২) রয়েছে, সে সকল হরফকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে। যেমন-

إِلٰهَ النَّاسِ لِيَرْبِّهِمْ لَكُنُودٌ مَّا لَهُ وَمَا كَسَبَ

এখানে ل (লাম) হরফের ওপর খাড়া ববর (١), ১ (হা) হরফের নিচে খাড়া বের (٢) এবং ১ (হা) হরফের ওপর উন্টো পেশ (٣) রয়েছে। সুতরাং, ل-১-১ (লাম, হা, হা) হরফগুলোকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

২. মাদ্দে ফারঈ (শাখা মাদ্দ)

ফারঈ অর্থ শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। মাদ্দে আসলি থেকে যে সকল মাদ্দ বের হয় তাকে মাদ্দে ফারঈ বলে। অর্থাৎ মাদ্দের হরফের পরে জহম (١) বা হামযা (٢) বা তাশদিদ (٣) থাকলে সেসব স্থানে দীর্ঘ করে পড়তে হয়। একে মাদ্দে ফারঈ বলে।

উদাহরণ

ক. آٰلَآءِ - এ শব্দে মাদ্দের হরফ এর পর লাম হরফে জহম (١) হয়েছে। এটি মাদ্দে ফারঈ। অতএব, আমরা এ স্থানে হামযাকে লম্বা করে পড়ব।

খ. جَاءَ وَمَا ذَرَكْ - এ উদাহরণ দুটিতে মাদ্দের হরফ আলিফ এর পর হামযা এসেছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে জিম (ج) ও মিম (م) হরফকে মাদ্দে ফারঈ হিসেবে দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

গ. وَلَا الطَّالِئِينَ كَآئَةً - আলোচ্য উদাহরণখানে মাদ্দের হরফ আলিফ এর পর লাম (ل) এবং ফা (ف) হরফে তাশদিদ (٣) হয়েছে। এটি মাদ্দে ফারঈ-এর অন্যতম নমুনা। এরূপ ক্ষেত্রেও হরফকে লম্বা করে পড়তে হবে।

উল্লেখ্য, আল কুরআনের অনেক স্থানে হরফের ওপর এসব মাদ্দের চিহ্ন দেওয়া থাকে। যেমন- (١), (٢) হরফের ওপর এরূপ চিহ্ন থাকলে সে হরফকে লম্বা করে পড়তে হয়। হরফের উপর (٣) চিহ্ন থাকলে চার আলিফ এবং (٤) চিহ্ন থাকলে তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে। যেমন- أُولَٰئِكَ-مَّا أَغْنَىٰ

দলীয় কাজ : মাদ্দের প্রকারভেদের একটি তালিকা তৈরি কর।

বাড়ির কাজ : মাদ্দের নাম ও কোন্ মাদ্দ কয় আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয় তা লিখ।

পাঠ-৪

ওয়াক্ফ (وَقْف)

ওয়াক্ফ আরবি শব্দ। এর অর্থ বিরতি দেওয়া, থামা, স্থগিত রাখা ইত্যাদি। তাজবিনের পরিভাষায় তিলাওয়াতের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে বিরতি দেওয়াকে ওয়াক্ফ বলে। অন্য কথায়, দুই নিঃশ্বাসের মধ্যবর্তী বিরতির সময়কে ওয়াক্ফ বলা হয়।

আল-কুরআন তিলাওয়াতে ওয়াক্ফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমরা বেশি সময় নিঃশ্বাস ধরে রাখতে পারি না। কিছুক্ষণ পরপর আমাদের শ্বাস নিতে হয়। তিলাওয়াতের সময়ও একশ্বাসে পুরো তিলাওয়াত করা সম্ভব নয়। এ জন্য আয়াতের মধ্যে থামতে হয়। আয়াতের মধ্যে এরূপ বিরতি দেওয়াই ওয়াক্ফ।

তাজবিন হলো কুরআন সুন্দর ও শুশ্রূষে তিলাওয়াতের নাম। সুতরাং তিলাওয়াতকালে যেখানে ইচ্ছা সেখানে থামা যাবে না। তাতে কুরআন তিলাওয়াতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। অনেক সময় অর্ধেকও পরিবর্তন হয়ে যায়। অতএব, নির্ধারিত স্থানে ওয়াক্ফ করতে হবে। আমাদের প্রিয় নবি (স.) সূরা ফাতিহায় প্রত্যেক আয়াতের পর ওয়াক্ফ করতেন। ওয়াক্ফ করলে শেষ হরফের ওপর জহয উচ্চারণ করতে হবে। কোনো হরকত (যবর, যের, পেশ) উচ্চারণ করে থামা যাবে না। তবে কেউ অপারণ হলে বা শ্বাস রাখতে না পারলে নির্ধারিত স্থানের পূর্বেই ওয়াক্ফ করতে পারবে। এক্ষেত্রে তিলাওয়াত করার সময় পুনরায় যে শব্দ ওয়াক্ফ করেছে সে শব্দ থেকে তিলাওয়াত করতে হবে।

আল-কুরআনে ওয়াক্ফের নানা রকম চিহ্ন দেওয়া আছে। এগুলো হলো বিরাম চিহ্ন। এগুলো সম্পর্কে জানা থাকলে শুশ্রূষভাবে ওয়াক্ফ করা যায়। নিম্নে এ সমস্ত চিহ্নসমূহের পরিচয় দেওয়া হলো-

○ - এ চিহ্নকে বলা হয় 'ওয়াক্ফ তাম'। এটি বাক্য বা আয়াতের চিহ্ন। অর্থাৎ এ চিহ্ন দ্বারা আয়াত শেষ হওয়া বোঝা যায়। এ চিহ্নে থামতে হবে।

◌ - একে 'ওয়াক্ফ লায়িম' বলে। এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা অত্যাৱশ্যক। এতে ওয়াক্ফ না করলে আয়াতের অর্থ বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

⏟ - এটি 'ওয়াক্ফ মুতলাক' এর চিহ্ন। এরূপ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা উত্তম।

⏟ - এটি 'ওয়াক্ফ জারিয়' এর চিহ্ন। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা কিংবা না থামা উভয়ই জায়েয। তবে এতে ওয়াক্ফ করা ভালো।

⏟ - একে 'ওয়াক্ফ মুজাওয়ায' বলে। এ চিহ্নে না থামা ভালো।

◌ - এ চিহ্নকে বলা হয় 'ওয়াক্ফ মুরাখ্বাস'। এখানে না থামা ভালো। তবে অপারণ হলে এ স্থানে থামা যাবে।

⏟ - এ চিহ্নে থামা ও না থামা প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। তবে এতে না থামা ভালো।

⏟ - এটি ওয়াক্ফ আমর। অর্থাৎ এতে থামার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে থামা উচিত।

⏟ - এটি না থামার নির্দেশ। এরূপ স্থানে না থেমে মিসিয়ে পড়তে হবে।

◌ - এ চিহ্নিত স্থানে বিরতি দেওয়া বা না দেওয়া উভয়ই জায়েয। তবে বিরতি দেওয়াই উত্তম।

صلى - এ স্থানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।

س/سكته - এ চিহ্নের নাম সাকতাহ। এরূপ চিহ্নিত স্থানে শ্বাস ছাড়া যাবে না। অর্থাৎ পড়া বন্ধ থাকবে তবে শ্বাস জারি থাকবে।

ش/مع/معانقة - এ চিহ্নের নাম মুআনাকা। আয়াতের বা শব্দের ডানে এবং বামে (তিনবিন্দু) অথবা مع চিহ্ন থাকে। এ অবস্থায় তিলাওয়াতকালে এক স্থানে থামতে হয় এবং অপর স্থানে মিলিয়ে পড়তে হয়।

وقف النبی - ওয়াকফুন নাবি (স.)। এরূপ চিহ্নিত স্থানে প্রিয় নবি (স.) ওয়াকফ করেছিলেন।

وقف جبرائیل - ওয়াকফ জিবরাইল (আ.)। এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি দিলে বরকত লাভ হয়।

وقف غفران - ওয়াকফ গুফরান। এ স্থানে থামলে পুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়।

দলীল কাজ : শিক্ষার্থী ওয়াকফের চিহ্নসমূহের একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ - ৫

নাযিরা তিলাওয়াত

আল-কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত অত্যধিক। পবিত্র কুরআন মুখস্ব তিলাওয়াত করা যায়। আবার দেখেও পাঠ করা যায়। দেখে দেখে তিলাওয়াত করাকে নাযিরা তিলাওয়াত বলে। নাযিরা তিলাওয়াত একটি উত্তম ইবাদত। আত্মাহ তাআলা এরূপ তিলাওয়াতকারীকে অতিরিক্ত সন্মান ও মর্যাদা দান করবেন। আমরাও বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করব।

কুরআন তিলাওয়াতের আদব

আল-কুরআন অত্যন্ত মর্যাদাবান গ্রন্থ। সুতরাং অত্যন্ত আদবের সাথে এ কিতাব তিলাওয়াত করা উচিত। আল-কুরআন তিলাওয়াতের কতিপয় আদব নিচে দেওয়া হলো-

ক. পূর্বরূপে ওয়ূ করে পাক-পবিত্র জায়গায় বসা।

খ. পবিত্র কুরআনকে উঁচু কোনো কিছুর উপর রাখা।

গ. মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত করা। কোনেবুপ কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা না করা।

ঘ. ধীরে ধীরে তাআবিদের সাথে তিলাওয়াত করা।

ঙ. আত্মাহ তাআলার সজ্জ্বি লাভের জন্য তিলাওয়াত করা।

শ্রেণির কাজ

- এ শ্রেণিতে নাযিরা তিলাওয়াতের পাঠ হলো- সূরা আল বাকরার পঞ্চম হুকু থেকে অষ্টম হুকু পর্যন্ত।
- শিক্ষক প্রথমে দেখে দেখে শুধু ও সুন্দরভাবে এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করবেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা মনোযোগ

সহকারে শুনবে। কোনোরূপ কথাবার্তা, হাসি-তামাশা, ইটগোল করবে না।

- এরপর শিক্ষার্থীরা একেবাকুন করে তিলাওয়াত করবে। শিক্ষক তা শুনবেন। কারো কোনো ভুল হলে তা সংশোধন করে দেবেন। শিক্ষকের নির্দেশনামত শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভুলগুলো ঠিক করে নেবে।
- অতঃপর শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকের পুনরায় তিলাওয়াত করবে এবং শিক্ষক শুনবেন। শূন্য না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবেন। এভাবে শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলপূর্ণ ভাঙ্গবিন্দ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শিখবে। অতঃপর বাড়িতে নিয়মিত তিলাওয়াতের অভ্যাস করবে।

অর্থ ও পটভূমিসহ কুরআনের কতিপয় সূরা

পাঠ - ৬

সূরা আল-আদিয়াত (سُورَةُ الْاٰدِيٰتِ)

সূরা আল-আদিয়াত পবিত্র কুরআনের ১০০তম সূরা। এটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এ সূরার প্রথম শব্দ আল-আদিয়াত। এ শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ সূরার আয়াত সংখ্যা সর্বমোট ১১টি।

তৎকালীন আরবে যখন এক ভয়ংকর অরাজকতা ও অস্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল, আরবের গোত্রসমূহ পরস্পর রক্তপাত ও লুণ্ঠনে নিয়োজিত ছিল, কোন গোত্রই নিরাপদে ছিলনা। এ প্রেক্ষাপটে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয় একথা স্মরণ করে দেয়ার জন্য যে, ধন-সম্পদের লোভে অন্যায় অসৎ কর্ম করলে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে।

শব্দার্থ

و	-	শপথ, কসম	كُنُودٌ	-	অকৃতজ্ঞ
الْعٰدِيٰتِ	-	ধাবমান অশ্বরাজি	شَوٰهِيْدٌ	-	সাক্ষী, অবহিত
ضَبَآءٍ	-	উর্ধ্বশ্বাসে	حُبًّ	-	ভালোবাসা, আসক্তি
فَالْمُؤْرِثِ	-	অগ্নিস্থলিঙ্গ বিচ্ছুরণকারী	غَيْرِ	-	ভালো, কল্যাণ, ধন-সম্পদ
فُلُجًا	-	সুরাঘাতে, সুরের আঘাতে	شٰدِيْدٌ	-	কঠোর, কঠিন, প্রবল
الْمُؤْرِثِ	-	হামলাকারী, আক্রমণকারী, অভিযানকারী	نُجُوْزٍ	-	উখিত হবে, উঠানো হবে
ضَبَآءٍ	-	প্রত্যুষে, প্রভাতে, প্রভাতকালে	حٰطِلٌ	-	প্রকাশ করা হবে
اَكْرَنَ	-	উৎকৃষ্ট করে	اَلْقٰنُوْرِ	-	অন্তরসমূহ, বক্ষসমূহ
نَقَآءٍ	-	ধূলি	غِيُوْرٍ	-	অবহিত, সর্বজ্ঞাত
وَسَطٰنٍ	-	মধ্যে হুকে পড়ে			

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبَآءٍ

১. শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির,

فَلَمْ يُؤْخَذِ قَدْحًا ۝

২. যারা কুরের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গা বিচ্ছুরিত করে,

فَلَمْ يُؤْخَذِ صُبْحًا ۝

৩. যারা প্রভাতকালে অভিযান চালায়,

فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ۝

৪. আর সে সময় ধূলি উষকিস্ত করে;

فَوَسَطْنَ بِهِ جَنَّةً ۝

৫. অতঃপর শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়ে,

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝

৬. নিচমাই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ

وَأَنَّهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝

৭. আর সে এ বিষয়ে অবশ্যই অবহিত,

وَأَنَّهُ يُخَيِّبُ الْخَاسِرِينَ ۝

৮. এবং নিচমাই সে ধন-সম্পদের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত।

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝

৯. তবে কি সে সেই সশরকে অবহিত নয়, যখন কবরে যা আছে তা উন্মিত হবে?

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّلُورِ ۝

১০. এবং অন্তরে যা কিছু আছে তা প্রকাশ করা হবে?

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ ۝

১১. সেদিন তাদের কী হবে, সে সশরকে তাদের প্রতিপালক অবশ্যই সবিশেষ অবহিত।

ব্যাখ্যা

এ সূরা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পাঁচ আয়াতে আদ্বাহ তাআলা সামরিক অশুর নানা গুণ বর্ণনা এবং এগুলোর শপথ করেছেন। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আদ্বাহ তাআলা মানুষের দুটি বিশেষ স্বভাব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো-

ক. সূর্য্যের প্রতি অকৃতজ্ঞতা।

খ. সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা।

আর মানুষ খেচ্ছায়, সম্মানে এ দুটি কাজ করে থাকে। অতঃপর এগুলো মানুষের করা একেবারেই অনুচিত।

এ জন্য সূরার শেষ পর্যায়ে মানুষকে আখিরাতে ও কবরের জীবনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ কি জানে না যে তাকে কবরে যেতে হবে। অতঃপর কিয়ামতে তাদের সকল কার্যকলাপ প্রকাশ করা হবে। এমনকি সে অন্তরে যেসব অকৃতজ্ঞতা ও লোভ-লালসা গোপন করত, তাও প্রকাশ করা হবে। পরিশেষে সমস্ত কিছু বিচার করা হবে। আর সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে আদ্বাহ তাআলা খুব ভালোভাবেই অবহিত। সুতরাং মানুষের উচিত সকল অন্যায় ও অকৃতজ্ঞতা ত্যাগ করে সংগে জীবনযাপন করা।

শিক্ষা

এ সূরা থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষা লাভ করি :

- নিয়সন্দেহে মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।
- ধন-সম্পদের প্রতিও মানুষের আসক্তি প্রবল।
- আখিরাতে মানুষের অন্তরের গোপন বিষয়ও প্রকাশ করা হবে।
- অতঃপর আদ্বাহ তাআলা মানুষের হৃদয় ফাটলানো করবেন।

অতঃপর, আমরা সর্বদা এ সূরার শিক্ষা মনে রাখব। আদ্বাহ তাআলার নিয়ামতের শুরুর আদায় করব। কখনোই তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হব না। সাথে সাথে ধন-সম্পদের লোভে পড়ে অন্যায় ও অসৎ কাজ করব না। বরং আখিরাতে জবাবদিহি করার কথা মনে রেখে সর্বদা আদ্বাহ তাআলার অনুগত করব।

বাড়ির কাজ : সূরা আদ্বাহের তিনটি শিক্ষা শিক্ষার্থী খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ - ৭

সূরা আল-কারিআহ (سُورَةُ الْكَافِرَاتِ)

সূরা আল কারিআহ যিকি সূরাশমূহের মধ্যে অন্যতম। এটি পবিত্র কুরআনের ১০১তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ১১টি।

এ সূরার প্রথম শব্দ আল কারিআহ। কারিআহ অর্থ সজোরে আখ্যাতকারী। কিয়ামত বা মহশ্বলয় পৃথিবীকে সজোরে আখ্যাত করবে বলে একে কারিআহ বলা হয়। এ সূরায় কিয়ামতের নানা অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। এ জন্য এ সূরার নাম রাখা হয়েছে আল কারিআহ বা মহশ্বলয়।

ভৎসালীন আরবে মানুষ যখন পারস্পরিক ঘন্স-সংঘাত, ছুটতরাজ ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল তখন তাদেরকে কিয়ামতের মহশ্বলয় এবং হাশরের বিচার ও দোযখের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এ সূরাটি নাখিল হয়েছে।

শব্দার্থ

الْقَارِعَةُ	- মহাশলয়, সজোরে আখ্যাতকারী	مَوَالِنَ	- পাদাসমূহ, পরিমাপ দত্তগুলো
يَوْمَ	- দিন	عِيشَةٍ	- জীবন, জীবিকা
الْقَارِئِ	- পতঙ্গ	زَاهِقَةٍ	- সন্তোষজনক
الْمُنْقُوبِ	- বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো-ছিটানো	عَفْوَ	- হালকা হবে
أُجْمَلٍ	- পর্বতসমূহ	أُفٍّ	- হান, জায়গা, ঠিকানা
أُجْمَلٍ	- রসিন পশম	عَاوِنَةٍ	- হাবিয়া, গভীর পর্ত, এটি একটি জাহান্নামের নাম
الْمُنْفُوشِ	- ধূনিত	كَارٍ	- আশ্রন
تَلْفَافٍ	- ভারী হবে	عَامَّةٍ	- উত্তম, প্রজ্জলিত, জ্বলন্ত

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

الْقَارِعَةُ

১. মহশ্বলয়,

مَا الْقَارِعَةُ

২. মহশ্বলয় কী?

وَمَا أَذْرَكَ مَا الْقَارِعَةُ

৩. আশনি কি জানেন মহশ্বলয় কী?

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝

৪. সেদিন মানুষ হবে বিকিস্ত পতঙ্গের মতো।

وَيَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُفُوسِ ۝

৫. আর পর্বতসমূহ ধ্বনিত রক্তিন পশমের মতো হবে।

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝

৬. অতঃপর সেদিন যার পাণ্ডা ভারী হবে,

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝

৭. সে লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন।

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝

৮. আর যার পাণ্ডা হালকা হবে,

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝

৯. তার স্থান হবে হাবিয়া।

وَمَا أَذْرَكَ مَا هِيَ ۝

১০. আপনি কি জানেন তা কী?

كَأَرْحَامِيَّةٍ ۝

১১. তা অতি উক্তান্ত আগুন।

ব্যাখ্যা

সূরা আল কারিআহতে আদ্বাহ তাআলা দুই ধরনের বিষয় উল্লেখ করেছেন। সূরার প্রথম পাঁচ আয়াতে আদ্বাহ তাআলা কিয়ামত বা মহশ্রলয়ের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। কিয়ামতের মাধ্যমে আদ্বাহ তাআলা সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস করবেন। এ জন্য এ সূরায় তিনি আল-কারিআহ বা মহশ্রলয় শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। সেদিন এ পৃথিবীর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বড় বড় পাহাড়-পর্বত পর্বত সেদিন ধ্বনিত পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে। মানুষ কীটপতঙ্গের ন্যায় বিকিস্ত হয়ে পড়বে। আসমান, জমিন, সাগর, নদী, বন-জঙ্গল সবকিছুই সেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন সুখ আদ্বাহ তাআলা থাকবেন। তিনি ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ সূরায় দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ ৬টি আয়াতে আত্মা তাআলা দুনিয়ার কাজকর্মের পরিণতি বর্ণনা করেছেন। হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষের হিসাবনিকাশ নেওয়া হবে। মানুষের পাপপুণ্য পাষ্টায় ওজন করা হবে। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি পুণ্য বা নেক কাজ করবে, তার পুণ্যের পাষ্টা ভারী হবে। সে লাভ করবে চিরশান্তির জাদ্বাত। সে সেখানে সম্বুট চিঠে বসবাস করবে। অপরদিকে যার পুণ্যের পাষ্টা হালকা হবে তার পাপের পাষ্টা ভারী হবে। তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। হাবিয়া নামক দোষধ হবে তার বাসস্থান। হাবিয়া খুবই গভীর স্থান। এতে রয়েছে উত্তমত আগুন। সেখানে পাপীরা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

শিক্ষা:

- এ দুনিয়ার জীবন ও দুনিয়া উত্তরই ক্ষণস্থায়ী।
- মহাশ্রলয়ের মাধ্যমে আত্মা তাআলা গোটা দুনিয়া ও সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস করে দেবেন।
- হাশরে মানুষের ভালোমন্দে পরিণতি করা হবে।
- নেককার ব্যক্তির স্থান হবে চিরশান্তির জাদ্বাত।
- আর পাপীদের ঠিকানা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির জাহান্নাম।

অমরা এ সূরাটি অর্থসহ মুখস্থ করব। এ সূরার শিক্ষা অনুসারে সর্বদা ভালো কাজ করব। অন্যায় ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকব।

বাঙ্কির কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আল-কারিআহর শিক্ষাগুলো লিখে বাড়ি থেকে একটি পোস্টার তৈরি করে নিয়ে আসবে।

পাঠ - ৮

সূরা আত-তাকাসুর (سُورَةُ التَّكْوِيْرِ)

এ সূরার প্রথম আয়াতে বর্ণিত তাকাসুর শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা আত-তাকাসুর। এটি পবিত্র কুরআনের ১০২তম সূরা। এটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা ৮টি।

রাসূলুল্লাহ (স.) একদা সাহাবিগণকে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন ক্ষমতা কারও নেই যে সে দৈনিক এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে। উত্তরে তারা বলেন, হ্যাঁ এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি করজনেরইবা আছে? অতঃপর রাসূল (স.) বলেন, তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন সূরা তাকাসুর পাঠ করতে পারবে না? উল্লেখ্য, প্রতিদিন এই সূরা একবার পাঠ করা এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করার সমান। (মায়হরি)

শানে নুহুল

কুরাইশের শাখাগোত্র ছিল বনু আবদি মানাফ, বনু কুসাই ও বনু সাহয। এদের প্রত্যেক গোত্র অপর গোত্রকে লক্ষ্য করে বলত, কি নেতৃত্ব, কি ক্ষমতা কিংবা জনসংখ্যা সবদিক থেকেই আমরা তোমাদের ওপরে। এতে করে প্রথমে বনু আবদি

মানাফই সবার ওপরে প্রমাণিত হলো। শেষে সবাই বলল, আমাদের মধ্যে যারা মারা গেছে তাঁদেরকেও হিসাব করব। কাজেই তারা কবরস্থানে গিয়ে হাজির হলো এবং কোনটা কার কবর তা বলে বলে গুনতে শুরু করল। এবার বনু সাহমের সংখ্যায় তিন পরিবার বেশি হলো। কেননা জাহিলি যুগে তাঁদের জনসংখ্যা বেশি ছিল। এরই পরিশ্রেকিতে এই সূরা নাখিল হয়।

শব্দার্থ

أَلْهَأَكُمُ	- তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করেছে, মোহাবিষ্ট করেছে	لَوْ	- যদি
الْأَعْيُنُ	- প্রাচুর্য, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা	عَلِمَ	- জ্ঞান
عَلَى	- পর্যন্ত, যতক্ষণ না, এমনকি	الْيَقِينِ	- সূড় বিশ্বাস, নিশ্চিত
رُزْمُ	- তোমরা সাক্ষ্য করেছে, তোমরা উপনীত হয়েছে, তোমরা মুখোমুখি হয়েছে।	أَلْجَنَّةِ	- জাহিম, একটি জাহান্নামের নাম
الْمَقَابِرِ	- কবরসমূহ	عَوْنِ	- চক্ষু, চোখ
كَلَّا	- কখনোই না	يَوْمَئِذٍ	- সেদিন
سَوْفَ	- অচিরেই, শীঘ্রই	عَنْ	- হতে, থেকে, সম্পর্কে
تَعْلَمُونَ	- তোমরা জানবে	الْجَنَّةِ	- নিরামত
لَمْ	- অতঃপর, আবার		

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আত্মার নামে।

أَلْهَأَكُمُ التَّكَاوُرُ

১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।

حَتَّى رُزْمُ الْبِقَابِرِ

২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। (এমনকি এ অবস্থায় তোমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যাও)

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

৩. এটা সঙ্গত নয়, তোমরা অচিরেই তা জানতে পারবে।

لَمْ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

৪. আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে।

لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ

৫. সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝

৬. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْمُتَّقِينَ ۝

৭. আবার বলি, তোমরা তা অবশ্যই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে দেখবে।

ثُمَّ لَنُنَسِّلَنَّ يَوْمَ مِيزِ عَنِ النَّعِيمِ ۝

৮. অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

ব্যাখ্যা

এ সূরায় ধন-সম্পদের মোহ ও প্রতিযোগিতা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা ইত্যাদির প্রতি লোভী। প্রাচুর্য লাভের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকা অবস্থাতেই মানুষের মৃত্যু এসে যায়। অথচ সে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কোনো প্রস্তুতিই নিতে পারে না। কিছু এতুপ করা ঠিক নয়। কেননা ধন-সম্পদ হলো ক্ষণস্থায়ী বিষয়। এগুলোর প্রতি মোহ মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অথচ আখিরাতের সাফল্য ও কল্যাণ এগুলোর তুলনায় কতই না উত্তম। মানুষের উচিত দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া। মানুষ যদি আখিরাতের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারে কখনোই দুনিয়ার প্রাচুর্যের প্রতি অকুণ্ট হত না।

মৃত্যুর পর মানুষ আখিরাতকে বুঝতে পারবে। আখিরাতের নানা বিষয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবে। অথচ সে তখন কিছুই করতে পারবে না। বরং দুনিয়ার প্রাপ্ত নিয়ামত সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। দুনিয়ার লোভ-লালসা ও অন্যান্য-অনৈতিকতার জন্য সে জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে।

শিক্ষা:

- সম্পদের প্রাচুর্যের প্রতি মোহাচ্ছন্ন থাকা উচিত নয়।
- এটি মানুষকে আখিরাত তুলিয়ে দেয়।
- অন্যান্যভাবে ধন-সম্পদ উপার্জনকারী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।
- আখিরাতে সকল কাজের হিসাব নেওয়া হবে।

অতএব, আমরা ধন-সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা করব না। বরং বৈধভাবে প্রয়োজনমত ধন-সম্পদ উপার্জন করব। আর আত্মা তাআলার নির্দেশনামত খরচ করব। অন্যান্যভাবে ধন-সম্পদ প্রাপ্তনের প্রতিযোগিতা করব না।

দলীল কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আত-তাকাসুরের শানে নুযুল পাশের বাক্যকে বলবে।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আত-তাকাসুরের শিক্ষাগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ - ৯

সূরা আল-লাহাব (سُورَةُ الْاَلْهَبِ)

সূরা আল-লাহাব মক্কা নপরীতে অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ৫টি। এ সূরায় আবু লাহাবের চরিত্র ও পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বিখ্যাত এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা লাহাব। এটি আল-কুরআনের ১১১তম সূরা।

শানে নুহুল

একদা রাসুলুল্লাহ (স.) সাফ পর্বতে আরোহণ করে কুরাইশদের ডাক দিলেন। তৎকালীন সময়ে আরবে বিপদাপদের ক্ষেত্রে এভাবে আহ্বান করার প্রচলন ছিল। তাই রাসুল (স.)-এর ডাকে সকলেই পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হলো। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি যদি বলি যে এ পাহাড়ের অপর পাশে একটি শত্রুদল তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। যেকোনো সময় তারা তোমাদের গুপ্ত ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাহলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে? সকলেই সম্মত হয়ে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করব। এরপর রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি তোমাদের এক ভীষণ শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি। (তোমরা স্বীকার কর যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ কর।) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর এ দাওয়াত শুন্যে আবু লাহাব বলে উঠল-

تَبَا لَكَ الْهَذَا جَمْعَتَنَا

অর্থ: 'তোমার ধ্বংস হোক। এ জন্যই কি তুমি আমাদের একত্র করেছে?'

অতঃপর আবু লাহাব রাসুল (স.)-কে পাথর মারতে উদ্যত হইল। আবু লাহাবের এ কথা ও কাজ অসহ্য হয়ে আল্লাহ তাআলা এ সূরা নাখিল করেন। (সহিহ্ বুখারি)

শব্দার্থ

تَبَا	- ধ্বংস হোক, বিনষ্ট হোক।
يَا	- দু হাত
يَا	- হাত
مَا أَغْنَىٰ	- কোনো কাজে আসে নি, কোনো উপকার আসে নি, রক্ষা করে নি
كُسْبِ	- সে উপার্জন করেছে
سَيُضِلُّ	- সে অচিরেই প্রবেশ করবে
إِلَىٰ	- আশ্রয়, সোচ্চার

كَانَتْ لَهَبٍ	- পেলিহান, শিখামুত
إِفْرَاقُهُ	- তার স্ত্রী
عِيَاةُهُ	- বহনকারিণী
الْعَطَشِ	- কাঠ, লাকড়ি, ইছন
وَجَدِي	- গলা
عَيْلٍ	- রশি, ফাঁস, রজ্জু
مَتَدِي	- পাকানো, প্যাচানো

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

تَبَا يَا أَبَى لَهَبٍ وَتَبَا

১. আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ

২. তার ধন-সম্পদ ও বা সে উপার্জন করেছে তা কোনো কাজে আসেনি।

سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذَا تَلَهَّبَ ۖ

৩. শীঘ্রই সে সেগিহান আগুনে প্রবেশ করবে।

وَأَمْرٌ أَتَىٰ الْمَلَائِكَةَ الْخَطِيئَ ۖ

৪. এবং তার স্ত্রীও (প্রবেশ করবে) যে ইশ্বন বহন করে।

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۖ

৫. তার গলায় পাকানো রশি।

ব্যাখ্যা

আবু লাহাব ছিল ইসলাম ও নবি করিম (স.)-এর শত্রু। সে সর্বদাই ইসলামের শত্রুতায় লিপ্ত ছিল। এ সুরায় তার শোচনীয় পরিণতির কথা বলা হয়েছে। আবু লাহাব ছিল রাসুল (স.)-এর চাচা। মক্কা নগরীতে সে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। সে প্রচুর ধন-সম্পদেরও মালিক ছিল। কিন্তু এত কিছুও তার কোনো কাজে আসেনি। বরং দুনিয়াতেও আবু লাহাবের ধ্বংস। আর আখিরাতেও সে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তার স্ত্রীও ছিল তারই মতো ইসলামের শত্রু। সেও রাসুল (স.)-কে কষ্ট দিত। সে রাসুল (স.)-এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। ফলে তার প্রতিও আল্লাহ তাআলার অভিশাপ রয়েছে এবং আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

শিক্ষা

- রাসুলুল্লাহ (স.) ও ইসলামের বিরোধিতা খুবই মারাত্মক কাজ।
- এর ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় সঙ্ঘর্ষের ধ্বংস অনিবার্য।
- দুনিয়ার মানসম্মান, ধন-সম্পদ ইসলামের এসব শত্রুকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আল-লাহাবের শিক্ষাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ - ১০

সূরা আল-ইখলাস (سُورَةُ الْإِخْلَاصِ)

সূরা আল-ইখলাস আল-কুরআনের ১১২তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৪টি। এ সূরাটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এ সূরার ফযিলত অত্যন্ত বেশি। মহানবি (স.) বলেছেন, এই সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান (সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)। অন্য একটি হাদিসে এসেছে, জটনৈক ব্যক্তি রাসূল (স.)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ সূরাটি খুব ভালোবাসি। উত্তরে নবি করিম (স.) বললেন, এর ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (জামি তিরমিযি)

শানে নুযূল

একবার মক্কার মুশরিকরা মহানবি (স.)-এর নিকট আল্লাহ তাআলার বংশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তাআলা এ সূরা নাখিল করেন। (জামি তিরমিযি)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন করেছিল আল্লাহ তাআলা কীসের তৈরী-স্বর্ণ, রৌপ্য না অন্য কিছুর? তাদের এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আল্লাহ তাআলা এ সূরা নাখিল করেন।

শদার্থ

قُلْ	-	আপনি বলুন, তুমি বল	لَمْ يَلِدْ	-	তিনি কাউকে জন্ম দেন নি
هُوَ	-	তিনি, সে	لَمْ يُولَدْ	-	তাকেও জন্ম দেওয়া হয় নি
أَحَدٌ	-	একক, এক-অধিতীয়	كُفُّوا	-	সমতুল্য, সাদৃশ্যপূর্ণ, সমকক্ষ
الصَّمَدُ	-	অমুখাপেক্ষী, বে-নিয়াহ, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, স্বয়ং সম্পূর্ণ।			

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

১. বলুন, (হে নবি!), তিনিই আল্লাহ, এক ও অধিতীয়।

اللَّهُ الصَّمَدُ

২. আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, (সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)

لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْ

৩. তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নি।

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

৪. আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

ব্যাখ্যা

এ সূরা তাওহীদ বা একত্ববাদের সুপ্রসিদ্ধ দলিল। এ সূরায় সংক্ষিপ্তরূপে আল্লাহ তাআলার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এতে মুশরিক ও কায়িরদের বিশ্বাসের জবাব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সবকিছু তিনি একাই সৃষ্টি করেছেন এবং একাই নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। বরং সৃষ্টি জগতের সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। আর তাঁর কোনো কিছুই প্রয়োজন নেই। তিনি সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নি। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। বিশ্বজগতে তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউই নেই।

শিক্ষা

- আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়।
- তাঁর সত্তা, পুর, কন্যা, পিতা-মাতা কেউ নেই।
- তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান।
- তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

আমরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করব। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করব না।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আল ইখলাসের শিক্ষাগুলো লিখে একটি রঙিন পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ - ১১

মুনাজ্জাতমূলক আয়াত

আল্লাহ তাআলা আমাদের রব। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও রক্ষক। তিনি অমুখাপেক্ষী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি আমাদের আলা, বাতাস, পানি, খাদ্য ইত্যাদি দান করেন। পৃথিবীর সকল নিয়ামত তাঁরই দান। তিনি আমাদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। তাঁর দয়া ও করুণাতেই আমরা দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা পাই। এককথায় সকল কিছু তাঁরই অধীন। তাঁর হুকুমেই সবকিছু পরিচালিত হয়। পার্থিব জীবনে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন, তাও তিনি দান করেন।

সুতরাং আমাদের উচিত তাঁরই কাছে সব কিছুর জন্য প্রার্থনা করা। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাঁর প্রয়োজন সচ্ছন্দ প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তাঁর প্রতি হুঁট হন।' (জামি তিরমিযি)। আল্লাহ তাআলার নিকট কিছু চাওয়ার

মাধ্যম হলো মুনাযাত করা। মুনাযাতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের চাহিদা জানাতে পারি। আল-কুরআনে মুনাযাতমূলক বহু আয়াত রয়েছে। এ পাঠে আমরা এরূপ তিনটি মুনাযাতমূলক আয়াত শিখব। অতঃপর এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট মুনাযাত করব।

আয়াত -

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়া না কর তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ২৩)

সর্বপ্রথম এ মুনাযাত হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করে জন্মাতে বসবাস করতে নির্দেশ দেন। জন্মাতে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে সকল নিয়ামত ভোগ করার অনুমতি দেন। শুধু একটি নির্দিষ্ট গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেন। কিন্তু আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) শয়তানের প্ররোচনায় ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। তাঁদের এ কাজের জন্য মহান আল্লাহ বেহেশত থেকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন। দুনিয়ায় এসে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন। তাঁরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে কান্নাকাটি করতে থাকেন। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা দয়ালবশ হয়ে তাঁদের উপরুক্ত মুনাযাত শিক্ষা দেন। অতঃপর হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এ মুনাযাতের মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁদের দোষা কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন।

এ আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুনাযাত। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমরা নানা রকম পাপ করে থাকি। আমরা আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে থাকি। এমনভাবেই আমাদের উচিত অপরাধসমূহ স্বীকার করা। অতঃপর এ মুনাযাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি দয়া করবেন এবং আমাদের পাপ মাফ করে দেবেন।

আয়াত-২

رَبَّنَا إِنَّا أَمِنَ لَكَ رَحْمَةً وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক। তুমি নিজ থেকে আমাদের প্রতি দয়া কর এবং আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা কর। (সূরা আল-কাহফ, আয়াত ১০)

মুনাযাতটি আসহাবে কাহফের যুবকগণ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা সূরা কাহফে তাঁদের ঘটনা ও মুনাযাত উল্লেখ করেছেন। আমাদের প্রিয় নবি (স.)-এর আগমনের কয়েকশ বছর পূর্বের ঘটনা। দাওদইয়দুস নামক এক অত্যাচারী বাদশাহ ছিল। সে ইমামদারদের ওপর খুব অত্যাচার করত। তার অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েকজন যুবক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। তাঁদের সাথে একটি কুকুরও ছিল। তাঁদেরকে আসহাবে কাহফ বলা হয়। তাঁরা গুহাতে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মগন থাকতেন। গুহায় থাকাক্ষর্য তাঁরা আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করে এ মুনাযাত করেন। আল্লাহ তাআলাও তাঁদের দোষা কবুল করেন।

দেওকর ও পুণ্যবানগণ কখনোই আদ্বাহ তাআলার ইবাদত ত্যাগ করেন না। শত অভ্যাচারেও তাঁরা যথায়যথাবে মহান আদ্বাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন। এ জন্য প্রয়োজনে নিজেদের ঘরবাড়ি, দেশত্যাগ করতেও শিছপা হন না। আমরাও তাঁদের মতো আদ্বাহ তাআলার ইবাদত করব। কোনো অবস্থাতেই আদ্বাহ তাআলার ইবাদত ছাড়ব না। বরং কোনো অসুবিধা দেখা দিলে আদ্বাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব। ফলে তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং আমাদের সকল কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবেন।

আয়াত-৩

رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই ওপর নির্ভর করেছি, তোমারই অতিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।' (সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত ৪)

এ মুনাযাত করেছিলেন হযরত ইবরাহিম (আ.)। কাকিরদের অভ্যাচার থেকে বাঁচার জন্য তিনি আদ্বাহ তাআলার নিকট এ মুনাযাত করেন।

বক্তৃত, আদ্বাহ তাআলা সকল কিছুই মালিক। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত আমরা কোনো কিছু করতে পারব না। সুতরাং সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সকল অবস্থায় আমরা আদ্বাহ তাআলার দয়ার ওপর নির্ভর করব। সকল কাজে তাঁরই অতিমুখী হব। তাহলে আদ্বাহ তাআলা আমাদের সাহায্য করবেন। উক্ত মুনাযাত আমাদের এ শিক্ষা প্রদান করে।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা মুনাযাতমূলক আয়াত তিনটি অর্থসহ একে অন্যকে মুখশব্দ বলবে।

বাঙ্কির কাজ : শিক্ষার্থীরা মুনাযাতমূলক আয়াত তিনটি পড়ার টেবিলের সামনে কুলিরে রাখার জন্য সুন্দর করে লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ - ১২

হাদিস শরিফ (الْحَدِيثُ)

হাদিস আরবি শব্দ। এর অর্থ কথা, বাণী ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্বন্ধিক হাদিস বলা হয়।

হাদিসের গুরুত্ব

মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আদ্বাহ তাআলা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে সত্য পথের সম্মান দিতেন। হাতে-কলমে পুণ্য ও ন্যায় কাজের শিক্ষা দিতেন। তাঁরা ছিলেন মানবজাতির আদর্শ। আমাদের প্রিয় নবি হযরত

মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি ও রাসুল। তাঁর পর আর কোনো নবি আসবেন না। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শই কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষ অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং তাঁর সকল কথা ও কর্ম সারেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। এগুলো জানার মাধ্যমেই আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারি। হাদিস শরিফ হলো নবি করিম (স.)-এর জীবনের সকল কাজ কর্মের সংরক্ষক। এর মাধ্যমেই আমরা মহানবি (স.)-এর সকল নির্দেশনা ও শিক্ষা জানতে পারি।

যদি হাদিস শরিফ না থাকত, তবে আমরা এসব কিছু জানতে পারতাম না। সুতরাং পুণ্য ও ন্যায়ের পথে চলার জন্য হাদিস শরিফের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

হাদিস ইসলামি জীবনব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস। আল-কুরআনের পরই হাদিসের স্থান। হাদিস আল-কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। আল-কুরআনে আত্মা তাআলা বহু নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মহানবি (স.) সেগুলো আমাদের সামনে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সেসব বিধান সাহাবীগণকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। হাদিস জানার মাধ্যমেই আমরা এগুলো জানতে পারি। আত্মা তাআলা বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ

অর্থ : 'রাসুল তোমাদের যা সেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।' (সূরা আল-হাশর, আয়াত ৭)

আত্মা তাআলার এ বাণীতে হাদিসের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। অতএব, আমরা হাদিস শরিফ জানব এবং সে অনুযায়ী যথাযথভাবে আমল করতে চেষ্টা করব।

সিহাহ সিত্তাহ (الصِّحَاحُ السِّتَّةُ)

সিহাহ শব্দের অর্থ শৃঙ্খল, সঠিক। আর সিত্তাহ শব্দের অর্থ ছয়। বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ বলা হয়। ছয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সহিহ হাদিসসমূহ এ ছয়টি গ্রন্থে একত্র করা হয়েছে। এগুলোর সাহায্যে আমরা নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে মহানবি (স.)-এর হাদিসসমূহ জানতে পারি।

নিম্নে আমরা উক্ত ছয়টি হাদিস গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানব :

১. সহিহ বুখারি

এ গ্রন্থের সংকলক হলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারি (র.)। তিনি ইমাম বুখারি নামে খ্যাত। তাঁর নামানুসারেই তাঁর সংকলিত কিতাবকে সহিহ বুখারি বলা হয়। তিনি সর্বমোট ছয় লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে তাঁর কিতাব সংকলন করেন। এটি ৩০ পারায় বিভক্ত। সহিহ বুখারি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ। বলা হয়, কুরআন মাজিদের পর সর্বাবিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো সহিহ বুখারি।

২. সহিহ মুসলিম

এটি সিহাহ সিত্তাহর দ্বিতীয় গ্রন্থ। বিশুদ্ধতার দিক থেকে সহিহ বুখারির পরই এর স্থান। এ গ্রন্থের সংকলক হলেন আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রি (র.)। তিনি তিন লক্ষ হাদিস থেকে বাছাই করে এ কিতাব সংকলন করেন।

৩. জামি তিরমিযি

এ কিতাবের সংকলক আবু ইসা মুহাম্মদ ইবন ইসা আত-তিরমিযি (র.)। এ কিতাবে প্রায় সব বিষয়ের হাদিস সংকলন করা হয়েছে। এ কিতাব সম্পর্কে বলা হয়- ‘যার ঘরে এ কিতাব থাকবে, মনে করা যাবে যে তার ঘরে নবি করিম (স.) আছেন এবং তিনি নিজে কথা বলছেন।’

৪. সুনানে আবু দাউদ

এ কিতাবের সংকলকের নাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশআছ (র.)। এ কিতাবের বিন্যাস পশ্চিতি অত্যন্ত উন্নতমানের। সর্বমোট ৫ লক্ষ হাদিস যাচাই-বাছাই করে এ কিতাব সংকলন করা হয়।

৫. সুনানে নাসাই

এর সংকলক আহমদ ইবন সুআইব আন-নাসাই (র.)। এর বিন্যাস-পশ্চিতি উচ্চমানের। সিহাহ সিতাহের মধ্যে এ কিতাব খানার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

৬. সুনানে ইবন মাজাহ

এটি সিহাহ সিতাহের সর্বশেষ কিতাব। এর সংকলকের নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবন মাজাহ।

আমরা বড় হয়ে হাদিসের এসব কিতাব পড়ব। এগুলো থেকে প্রিয় নবি (স.)-এর বাণী ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করব। অতঃপর এগুলোর শিক্ষা অনুসারে নিজের জীবন পরিচালনা করব।

দলীল কাজ : হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ ও এগুলোর সংকলকদের নাম নিজ খাতায় লিখে একটি চার্ট তৈরি করবে।

পাঠ - ১৩

মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিস

মুনাজাত হলো আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করা। মুনাজাত করার দ্বারা আল্লাহ তাআলার মহানত্ব প্রমাণিত হয়। কেননা যে ব্যক্তি দুর্বল, অসহায় সে-ই সাধারণত সাহায্য চায়। আর সাহায্যকারী স্বভাবতই ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। মহান আল্লাহের নিকট মুনাজাতের মাধ্যমে আমরা আমাদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করি। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার অমুখাপেক্ষিতা, ক্ষমতা, দয়্যা ইত্যাদি গুণের স্বীকৃতি প্রদান করি। সুতরাং মুনাজাতও একপ্রকার ইবাদত। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা খুশি হন। হাদিস শরীফে মুনাজাতমূলক বহু হাদিস রয়েছে। নিম্নে আমরা মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিস জানব।

হাদিস-১

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْعُقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى -

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়াত (সরল সঠিক পথের নির্দেশনা), তাকওয়া বা পরহেযগারি, পবিত্রতা ও অভাব-অনটন থেকে মুক্তি কামনা করছি।' (সহিহ মুসলিম ও জামি তিরমিহি)

হাদিস-২

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي -

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, আমাকে (সরল সঠিক) পথ দেখাও, আমাকে নিরাপদে রাখ এবং আমাকে রিযিক দান কর।' (সহিহ মুসলিম)

হাদিস-৩

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ -

অর্থ : 'হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দীনের (ইসলামের) ওপর দৃঢ় রাখ।' (জামি তিরমিহি)

দীনের ওপর দৃঢ়-সিঁকর থাকা মুমিনের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। উল্লিখিত হাদিসে আল্লাহ তাআলার নিকট এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

আমরা উপরিউক্ত মুনাজাতসমূহ শিখব। এগুলোর অর্থ জানব। অতঃপর এগুলোর দ্বারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করব। তাহলে আল্লাহ তাআলা খুশি হবেন। আমাদের ক্ষমা করবেন এবং দয়া করবেন। এভাবে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করব।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিসের অর্থ একটি পোস্টারে লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ - ১৪

নৈতিক গুণাবলি বিষয়ক তিনটি হাদিস

মানবশ্রেণি ও পরমতসহিহতা দুটি মহৎ গুণ। আমাদের সমাজে নানারকম লোকজন বসবাস করে। ধনী-গরিব, সাদা-কালো, সুস্থ-অসুস্থ, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবরকমের লোকদের নিয়েই আমাদের সমাজ। সবাই এ সমাজের সদস্য। সবাই মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সবায় মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা না থাকলে কোনো সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে না। আর এর জন্য প্রয়োজন মানুষের প্রতি শ্রীতি, দয়া-মায়ী, ভালোবাসা। ইসলাম ধর্মে

এগুলোর প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আমাদের মহানবি (স.) নিজে সকল মানুষকে ভালোবাসতেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে সদ্‌ব্যবহার করতেন। আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত সবাইকেই তিনি ভালোবাসতেন, নব্বার প্রতি দয়া করতেন। আমাদের তিনি এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিস শরিফে আমরা তাঁর এসব নির্দেশ দেখতে পাই।

আমাদের সমাজে মুসলমানগণের পাশাপাশি অমুসলিমগণও বসবাস করে। তারাও আত্মাহ তাআলায় সৃষ্টি। তাঁদের প্রতিও সদাচরণ করতে হবে। তাঁদের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি কোনোরূপ ঠাট্টা-তামাশা করা যাবে না। তাঁদেরকে স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করতে দিতে হবে। এটাই হলো মহানবি (স.) ও দীন ইসলামের শিক্ষা। হাদিস শরিফে এ সম্পর্কেও আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ পাঠে আমরা মানবশ্রেয় ও পরমন্তসহিহুতা-সম্ভ্রান্ত তিনটি হাদিস জানব।

হাদিস-১

لَا يَزِيحُ اللَّهُ مَنْ لَا يَزِيحُ النَّاسَ -

অর্থ: 'যে মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, আত্মাহ তাআলাও তার প্রতি দয়া করেন না।' (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

শিক্ষা

পৃথিবীর সকল মানুষ মহান আত্মাহর সৃষ্টি। সকলের প্রতিই সদাচার করতে হবে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি দয়া-মায়ার, ভালোবাসা দেখাতে হবে। এমন যেন না হয় যে আমরা শুধু ধর্মীদের ভালোবাসব, গরিবদের ভালোবাসব না। অদ্রুপ অমুসলিমদেরকে বাদ দিয়ে শুধু মুসলিমদের সাহায্য-সহযোগিতা করাও ঠিক নয়। বরং প্রয়োজন অনুসারে সকলের প্রতিই দয়া, ভালোবাসা ও সহযোগিতা করতে হবে। তাহলে আত্মাহ তাআলা খুশি হবেন এবং আমাদের প্রতি দয়া করবেন। সকল মানুষকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করাই এ হাদিসের শিক্ষা।

হাদিস-২

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ وَحْمٍ -

অর্থ: 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জন্মাতে প্রবেশ করবে না।' (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

শিক্ষা

আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। মা-বাবা, ভাই-বোন, খালা-খালু, ফুফু-ফুফা, দাদা-দাদি, নানা-নানি সকলেই আমাদের আত্মীয়। তারা আমাদের একান্ত আপনজন। এ ছাড়া আমাদের আরও বহু আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। সকলের সাথেই আমরা সম্পর্ক রক্ষা করে চলব। কারো সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন করব না।

আত্মীয়-পরিজন যদি অমুসলিমও হন তাঁদের সাথেও সম্পর্ক ত্যাগ করা যাবে না। বরং তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। সদাচার করতে হবে। প্রয়োজন সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। বিপদে-আপদে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে। আমরা সকল আত্মীয়ের সাথে সুন্দর সম্পর্ক রাখব। তবেই আমরা জন্মাতে প্রবেশ করতে পারব।

হাদিস-৩

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاوِدًا أَوْ انْتَقَضَ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَغْنِيهِ طَيْبٌ لِنَفْسٍ فَإِنَّ حُجُوجَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

অর্থ: 'সাবধান! কেউ যদি কোনো ব্যক্তির প্রতি যুলুম করে অথবা তাকে তার অধিকার থেকে কম দেয় কিংবা ক্ষমতাবহির্ভূত কোনো কাজ তার ওপর চাপিয়ে দেয় বা জোরপূর্বক তার থেকে কোনো মালামাল নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার (বিম্বি) পক্ষ অবলম্বন করব।' (আবু দাউদ)

শিক্ষা

মুসলিম-অমুসলিম সকলেই এদেশের নাগরিক। মুসলিম অমুসলিমগণের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়-অত্যাচার করা যাবে না। তাদের ধর্ম, জীবন, ধন-সম্পদ, সম্বন্ধ ইত্যাদির ক্ষতি করা যাবে না। শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মপালনে তাদের কোনোরূপ বাধা দেওয়া যাবে না। তাদের ধর্ম নিয়ে কোনোরূপ অবহেলা প্রদর্শন করা যাবে না। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। তাদের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সহর্মিতা প্রদর্শন করতে হবে। কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করলে, কষ্ট দিলে মরং নবি করিম (স.) কিয়ামতের দিন আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবেন না। আর মহানবি (স.) কারো পক্ষে সুপারিশ না করলে তার ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং আমরা সকল মানুষকে ভালোবাসব। কাউকে কষ্ট দেব না, কারো প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন করব না। সমাজের সকলকে ধর্ম পরিচয়ে নয়, মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে সকলের সাথে সম্ভাব্য বজায় রাখব।

বাফির কাজ: শিক্ষার্থী এ পাঠে উদ্ধৃত হাদিস তিনটি অর্থসহ মুখস্থ বলবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. জামিউল কুরআন অর্থ
২. দেখে দেখে তিলাওয়াত করাতে তিলাওয়াত বলে।
৩. মৃত্যুর পর মানুষ বুকেতে পারবে।
৪. আবু লাহব ছিল ও এর শত্রু।
৫. মুসলিমদের ন্যায় অমুসলিমগণও

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. একত্ববাদের প্রমাণ	সূরা আদিয়াত
২. আল-কুরআনের ১০০তম সূরা	হযরত উসমান (রা)
৩. স্থগিত রাখা	ওয়াক্বফ
৪. মাদে আসিলি	হযরত উমর (রা)–এর
৫. আল-কুরআন সংকলনের পরামর্শ	সূরা ইখলাস
	মূল মাদ

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তাজবিদ কাকে বলে?
২. নাবিরা তলাওয়াত বলতে কী বুঝায়?
৩. সিহাহ সিত্তাহ কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. কুরআন মজিদের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
২. কুরআন মজিদ সকলনের ইতিহাস বর্ণনা কর।
৩. সূরা আল-ইখলাসের শানে সুহুল ও শিক্ষা বর্ণনা কর।
৪. হাদিস কাকে বলে? হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন-

১. মাদের হরফ কয়টি?

- | | |
|---------|---------|
| ক. ৩টি | খ. ৬টি |
| গ. ১৪টি | ঘ. ১৫টি |

২. তোমরা কুরআন পাঠ কর, কেননা উহা পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে। হাদিসের উদ্দেশ্য-

- i. কুরআন পাঠের গুরুত্ব বর্ণনা করা
- ii. তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত করা
- iii. নিজে কুরআন শিক্ষা করা ও অপরকে শেখানো

কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|----------------|
| ১. i | ২. ii |
| ৩. i ও ii | ৪. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

এরফান নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করে কিন্তু তার তিলাওয়াত সুন্দর হয় না। একবার **لُحْن** (নুহন)

শব্দ তিলাওয়াতের সময়ে **ن** (নুন) বর্ণকে টেনে পড়ে নি।

৩. এরফান এক্ষেত্রে কি ত্যাগ করেছে?

- | | |
|------------|----------|
| ক. ওয়াক্ফ | খ. মাদ্দ |
| গ. মাখরাজ | ঘ. সিকাফ |

৪. এরফানের এ জাতীয় তিলাওয়াতে -

- i. সালাত শুম্ব হবে না
- ii. অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে
- iii. গুনাহ হবে

কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সুজননীল প্রশ্ন

১। নাবিহা প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করে। মেয়ের তিলাওয়াত শোনার জন্য বাবা মাওলানা আহমাদ সাহেব নাবিহার কাছে বসলেন। নাবিহা তিলাওয়াত শুরু করল। এবার তিলাওয়াতের সময়ে ৭ (মিম) চিহ্নে বিরতি দেয় নি, ^৬ (ফিহা) তিলাওয়াতের সময়ে ১ বর্ণ এবং ২ বর্ণ দীর্ঘ করে পড়ে নি। মেয়েকে উদ্দেশ্য করে নাবিহার বাবা বললেন, কুরআন মাজিদ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ। এর সুরেক্ষণ ও সংকলন নির্ভুল ও সন্দেহাতীত পন্থায় হয়েছে। তাই এর তিলাওয়াতও নির্ভুল হওয়া আবশ্যিক।

ক. 'মাযরাজ' শব্দের অর্থ কী?

খ. তাজবিদ বলতে কী বোঝায়?

গ. নাবিহা দ্বিতীয় পর্ষায় কোন বিষয়টি ত্যাগ করেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাওলানা আহমাদ সাহেব মেয়ে নাবিহাকে যে বিষয়টির প্রতি তাগিদ দিয়েছেন তার পুনরুৎপ্রাণণ কর।

২। আকরাম সাহেব একজন বিশিষ্ট সমাজপতি। একদিন তাঁর অসুস্থ প্রতিবেশী মনির মিয়া চিকিৎসার জন্য কিছু সাহায্য চাইলে তিনি তাকে তাড়িয়ে দেন। অপরদিকে আকরাম সাহেবের কনু আফজাল সাহেব তার অসহায় ফুফার মেয়ের বিবাহের যাবতীয় খরচ বহন করেন।

ক. বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ কয়টি?

খ. 'মানবশ্রেয় একটি মহৎগুণ'—ব্যাখ্যা কর।

গ. সাহায্যপ্রার্থী মনির মিয়ার প্রতি আকরাম সাহেবের আচরণে কী লজিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আফজাল সাহেবের কাজটি পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায় আখলাক (الْأَخْلَاقُ)

আখলাক আরবি শব্দ। এর অর্থ চরিত্র, স্বভাব, আচার-আচরণ, ব্যবহার ইত্যাদি। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে যেসব আচার, ব্যবহার, চালচলন এবং স্বভাবের প্রকাশ পায় সেসবের সমষ্টিই হলো আখলাক। এককথায় মানবচরিত্রের সব দিকই আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। মানবচরিত্রের সং ও অসং দিকগুলোর বিচারে আখলাককে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। আখলাকে হামিদাহ (প্রশংসনীয় আচরণ) এবং আখলাকে হামিমাহ (নিন্দনীয় আচরণ)

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- সদাচরণের পরিচয় ও কতিপয় সদাচরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অসদাচরণের পরিচয় ও এর কুফল বর্ণনা করতে পারব।
- ইসলামের সৃষ্টিতে ইতিহাসিক ও হিন্তাহিযের (রাহাজানি) নেতিবাচক প্রভাব এবং প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ - ১

আখলাকে হামিদাহ (الْأَخْلَاقُ الْحَمِيدَةُ)

মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে যেসব উত্তম আচার, ব্যবহার, চালচলন এবং স্বভাবের প্রকাশ পায় সেসবের সমষ্টিই আখলাকে হামিদাহ বা উত্তম চরিত্র বলা হয়। যেমন- পরোপকারিতা, শালীনতাবোধ, সৃষ্টির সেবা, আমানত রক্ষা, শ্রমের মর্যাদা, ক্ষমা ইত্যাদি।

আখলাকে হামিদাহের গুরুত্ব

মানবজীবনে আখলাকে হামিদাহের (উত্তম চরিত্রের) গুরুত্ব অপরিহার্য। মানবজীবনের সুখ-শান্তি আখলাকে হামিদাহ বা প্রশংসনীয় আচরণের ওপর নির্ভরশীল। প্রশংসনীয় আচরণের মাধ্যমেই উত্তম চরিত্র গড়ে ওঠে। আখিরাতেহর সুখ-সুখণ্ড আখলাকে হামিদাহের ওপর নির্ভর করে। যার স্বভাব-চরিত্র যত সুন্দর হবে, সে ততই সৎকর্মশীল হবে এবং আত্মাহর কাছে প্রিয় হবে।

আখলাকে হামিদাহের সুকল

১. মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসা লাভ

উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আমার নিকট অধিক প্রিয়, যার চরিত্র সর্বোত্তম।' (বুখারি ও মুসলিম)

২. ইমানের পূর্ণতা অর্জন

উত্তম চরিত্র মানুষের ইমানকে পূর্ণতা দান করে। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا -

অর্থ : 'চরিত্রের বিচারে যে উত্তম, মুমিনদের মধ্যে সেই পূর্ণতম ইমানের অধিকারী।' (আবু দাউদ)

৩. সর্বোত্তম মর্যাদা লাভ

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি আদ্বাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর নিকট উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন এবং সমাজের নিকটও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যার চরিত্র উত্তম।' (বুখারি)

৪. জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ

মহান আদ্বাহ উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই দেবেন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, "আদ্বাহ তাআলা যার গঠন ও স্বভাব সুন্দর করেছেন, দোষের অগ্নি তাকে ভক্ষণ করবে না।" (তাবারানি ও বায়হাকি)

দলীর কাজ : আখলাকে হামিলাহর সুকলতলো উল্লেখ কর।
বাড়ির কাজ : সদাচারনের শুক্লত বর্ণনা কর।

পাঠ - ২

পরোপকার (الْإِحْسَانُ)

মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে সমাজবান্ধ হয়ে বসবাস করে। আর সমাজবান্ধ হয়ে বসবাস করতে হলে পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজন। অন্যের প্রয়োজনে বা উপকারে আসার নামই হলো পরোপকার।

পরোপকারের আরবি প্রতি শব্দ হলো 'ইহসান' الْإِحْسَان, যার অর্থ অন্যের উপকার করা। আদ্বাহর সৃষ্টির প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে সেগুলোকে উত্তম বা যথাযথভাবে পালন করার নামই পরোপকার।

তাৎপর্য

পরোপকার মহান আদ্বাহর একটি বড় গুণ। মহান আদ্বাহ পরম দয়ালু। সমগ্র সৃষ্টির প্রতি তাঁর এ অসীম দয়া ও কবুলী বিরাজমান। তিনি সকল মানুষকে সমান যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে সৃষ্টি করেননি। এ কারণে মানুষ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। তাই মানুষ সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী অপরের উপকার করতে হবে।

পরোপকারের সুফল

১. আদ্বাহর ভালোবাসা লাভ

পরোপকারী ব্যক্তিদের আদ্বাহ তাআলা ভালোবাসেন। এ সম্পর্কে মহান আদ্বাহ বলেন,

وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

অর্থ : 'তোমরা সৎকর্ম ও পরোপকার কর। নিচয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীল ও পরোপকারীদেরকে ভালোবাসেন।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত -১৯৫)

২. সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়

পরোপকারের মাধ্যমে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পদ ব্যয় করে বা ভালো কথা বলেও মানুষের উপকার করা যায়। এতে সমাজ থেকে কণ্ডা-ফাসাদ দূর হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. শত্রু মিত্রে পরিণত হয়

পরম শত্রুকেও পরোপকারের মাধ্যমে আপন করা যায়। কঠোর হুদয়বিশিষ্ট লোকের অন্তরও জয় করা যায়।

৪. আল্লাহর রহমত লাভ

আল্লাহর কোনো সৃষ্টির প্রতি দয়া করলে তিনি দয়াকারী ব্যক্তির ওপর রহমত বর্ষণ করেন। এ সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর হাদিস –

إِزْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَزِدَّ حَقُّكُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ -

অর্থ : 'তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' (তিরমিযি)

৫. মানুষের ভালোবাসা অর্জন

দয়া বা পরোপকারের মাধ্যমে মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায়। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক বন্ধন মজবুত হয়। কঠিন হৃদয়ের মানুষকে বশুড়ের বশনে আবদ্ধ করা যায়। পরম শত্রুও মিত্রেতে পরিণত হয়।

আমরা সর্বদা সৃষ্টির সেবা করব। বিশদ-আশদে অপরের সাহায্য করব।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে মানুষকে কীভাবে উপকার করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ - ৩

الشَّالِيْنَتَاوَاثِ (الَّتْهَزِيْبُ)

শালীনতার আরবি প্রতিশব্দ 'তাহযিব' (الَّتْهَزِيْبُ), যার অর্থ ভ্রষ্টতা, নষ্টতা ও লজ্জাশীলতা। আচর-আচরণে, কথাবার্তায়, বেশভূষায় ও চালচলনে মার্জিত পন্থা অবলম্বন করাকে শালীনতা বলে।

গুরুত্ব

শালীনতা মানুষের একটি মহৎগুণ। এটির গুরুত্ব অপরিমীম। শালীনতাবেশ মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। শালীনতা আত্মাহার অনুগত বান্দা হতে সাহায্য করে। আচার-ব্যবহারে শালীন ব্যক্তিকে সবাই পছন্দ করে। শালীন পোশাক পরিচ্ছদ সৌন্দর্যের প্রতীক। শালীন ও তদ্রূপ আচরণের মাধ্যমে বশুত্ব ও হুম্যতা সৃষ্টি হয়। সমাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রাখতে শালীনতার প্রয়োজন সর্বাধিক। শালীনতাপূর্ণ আচার-ব্যবহার সমষ্টীতি ও সৌহারদের চাবিকাঠি।

অশোভন বা অশালীন পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচরণ অনেক সময় সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনে, সমাজে আত্মির সৃষ্টি করে। নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটায়।

শালীনতাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে বশুত্ব গড়ে উঠে। পক্ষান্তরে অভদ্র বা অশালীন আচরণ বশুত্বকেও দূরে ঠেলে দেয়। মানুষ অশালীন ব্যক্তিকে পছন্দ করে না। তার সাহচর্য পরিত্যাগ করে। মহানবি (স.) বলেন, 'মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার অশ্লীলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করে।' (বুখারি)

অশালীন ব্যক্তিকে আত্মাহ তা আলা কখনই পছন্দ করেন না। বরং অশালীন ব্যক্তিকে আত্মাহ তা আলা ঘৃণা করেন। এ সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর বাণী—

إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيئَ

অর্থ: 'মিসনেদেহে আত্মাহ তা আলা অশালীন ও দুচরিত্র ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।' (তিরমিযি)

শালীনতা মানুষের জীবনে অপরিহার্য বিষয়। মহান আত্মাহ আমাদেরকে শালীনতা শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা লুকমানে উল্লেখ আছে যে, হযরত লুকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে শালীনতা শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন,

'হে পুত্র, অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না। পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলো না, কারণ আত্মাহ কোনো উদ্ধত অহংকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। তুমি পদচারণ করবে সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করবে। নিচুই স্বরের মধ্যে গাধার স্বর সর্বাপেক্ষা অশ্লীলকর।' (সূরা লুকমান, আয়াত-১৯)

শালীনতার গুরুত্ব অপরিমীম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শালীনতা অবলম্বন করে চলা উচিত। এতে জীবন সুন্দর ও মধুময় হয়ে ওঠে। সমাজেও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে শালীন আচরণের সুফলগুলো পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

বাড়ির কাজ : 'অশালীন পোশাক পরিচ্ছদ ও আচরণ বিপর্যয় ডেকে আনে।' - ব্যাখ্যা কর।

পাঠ-৪

সৃষ্টির সেবা (خِدْمَةُ الْخَلْقِ)

ইসলামি পরিভাষায় আত্মাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতিশীল হয়ে আদর-যত্ন করার নামই হলো সৃষ্টির সেবা। মহান আত্মাহ এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাৎ তথা সৃষ্টির সেরা করে পাঠিয়েছেন। আর সৃষ্টিকুলের সবকিছু যেমন- জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, গাছশালা ইত্যাদি মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং এসব সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং এগুলোর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা অবশ্য কর্তব্য।

গুরুত্ব

যে সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে, আল্লাহ তার প্রতি খুশি হয়ে রহমত বর্ষণ করেন। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

إِزْمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَزِيحُكُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ -

অর্থ : 'তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' (তিরমিযি)

পৃথিবী ও এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর সৃষ্টি। সৃষ্টি জগতের সবকিছু নিয়ে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবার। আল্লাহর সৃষ্টি পরিবারে মানুষই সেরা সৃষ্টি। পরিবারে যেমন পরিবার প্রধানের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে তেমনি সৃষ্টি জগতের প্রতিও মানুষের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। সৃষ্টিকুলের প্রতি এ দায়িত্ব পালন করার নাম সৃষ্টির সেবা।

মানুষের ওপর প্রধানত দুই ধরনের কর্তব্য রয়েছে। প্রথমত সৃষ্টীর প্রতি কর্তব্য, তারপর সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য। সৃষ্টির প্রতি মানুষের কর্তব্যগুলোর মধ্যে অসহায় ও দুস্থ মানুষকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা যেমন কর্তব্য, তেমনি গাছপালা, পশুপাখি, বৃক্ষলতা এবং পরিবেশের প্রতিও মানুষের কর্তব্য রয়েছে। সৃষ্টির প্রতি সদয় হলে এবং এদের লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করলে আল্লাহ খুশি হন। তেমনি এদের প্রতি অবহেলা করলে, নিষ্ঠুর আচরণ করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। এ সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর হাদিস হলো—

الْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ- فَأَحْبِبِ الْخَلْقَ إِلَى اللّٰهِ مِنْ أَحْسَنِّ إِلَى عِيَالِهِ -

অর্থ : 'সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহর পরিবার, আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই প্রিয়, যে তার পরিবারের প্রতি বেশি অনুগ্রহ করেন।' (মিশকাত)

আমাদের চার পাশের কীটপতঙ্গ, গাছপালা, তবুলতা, পশুপাখি সবকিছুর প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। কারণ এ সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। আমাদের মাঝেই এ পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। মহান আল্লাহ এ সবকিছু আমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমাদের প্রিয় নবি (স.) সৃষ্টিজীবের প্রতি সর্বদা সদয় ছিলেন।

সমাজে কোনো ব্যক্তি পীড়িত হলে তার সেবা করতে হবে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে সমাজে একে অপরের সেবা ও সাহায্য করলে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়া যায়। প্রিয় নবি (স.) বলেছেন, 'যে মুসলমান অন্য মুসলমান ভাইয়ের অভাব মোচন করে আল্লাহ তায়ালা তার অভাব দূর করেন।' (মুসলিম)

গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি সকল প্রাণিরই আমাদের ন্যায় ক্ষুধা ও পিপাসা আছে। এদেরকে খেতে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।

মহানবি (স.) বলেন, 'কোনো এক মহিলা একটি বিড়াল বেঁধে রাখে। সে বিড়ালটিকে খেতে দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি বাতে পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে। অবশেষে বিড়ালটি রীষা অবস্থায় খাদ্যাভাবে মারা গেলে আল্লাহ ঐ মহিলাকে শাস্তি সেন (বুখারি ও মুসলিম)'।

প্রিয় নবি (স.) আরও বলেন- 'বনি ইসরাইলের এক পাসী মহিলা একটি ভৃক্ষার্ত কুকুরকে পিশাসায় কাতর দেখে পানি পান করায়। এতে আল্লাহ তাআলা ঐ মহিলার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন'। (বুখারি ও মুসলিম)

জীবজন্তুর মতো উদ্ভিদের প্রতিও সদয় হতে হবে। অকারণে গাছ কাটা উচিত নয়। গাছের পাতা হেঁড়া বা চারাগাছ উপড়ে ফেলাও উচিত নয়। গাছশালার বাদ্য করা উচিত। বৃক্ষলতাও মহান আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে। পরিবেশ রক্ষার ও নিজেদের প্রয়োজনে জীবজগৎ ও পরিবেশের প্রতি সদাচরণ করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আমরা সৃষ্টির সেবা করব, জীবজন্তুকে কষ্ট দেব না। অকারণে কোনো বৃক্ষের ক্ষতি করব না। বৃক্ষরোশন করব এবং এর যত্ন করব।

দশীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সৃষ্টির সেবামূলক কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ - ৫

আমানত (الْأَمَانَةُ)

আমানত অর্থ গচ্ছিত রাখা বা দায়িত্বে রাখা। গচ্ছিত বা দায়িত্বে রাখা বস্তু সম্বন্ধে রেখে এর মালিকের কাছে যথাযথভাবে ফেরত দেওয়ারকে আমানত রক্ষা বলে। যিনি আমানত রক্ষা করেন, তাকে আমানতদার বলে। আমানতের মাল নষ্ট করা বা আত্মসাৎ করার নাম খিয়ানত করা। আর আত্মসাৎকারীকে খিয়ানতকারী বলে।

গুরুত্ব

সমাজের প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ দায়িত্ব তার নিকট পবিত্র আমানত। সামাজিক শান্তি রক্ষার জন্য আমানত রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যিনি আমানত রক্ষা করেন, তাকে সবাই বিশ্বাস করে এবং ভালোবাসে। সমাজের সবাই তাকে মর্যাদা দেয়। আমানতের খিয়ানতকারীকে সমাজের কেউ পছন্দ করে না এবং বিশ্বাসও করে না। বরং তাকে সবাই ঘৃণা করে। আমানত রক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা বেন আমানতসমূহ তার মালিককে যথাযথভাবে ফেরত দাও।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৫৮)

আমানত রক্ষা করা ইমানের অঙ্গ। এ ব্যাপারে মহানবি (স.) বলেন,

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ -

অর্থ: 'যার আমানতদারি নেই, তার ইমানও নেই।' (বায়হাকি)

আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকের লক্ষণ।

মহানবি (স.) বলেন,

إِيَةُ الْمُنَافِي ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذِبًا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ -

অর্থ : ‘মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, আমানতের খেয়ানত করে।’ (বুখারি ও মুসলিম)

আমানতের খিয়ানতকারী ব্যক্তি আত্মাহ্বর কাছে ঘৃণিত। মানুষের কাছেও ঘৃণিত। এ সম্পর্কে আত্মাহ্ব তাআলার বাণী,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝

অর্থ : ‘নিচুই আত্মাহ্ব তাআলা খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।’ (সূরা আল-আনফাল, আয়াত ৫৮)

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা গ্রুপভিত্তিক আলোচনা করে আমানত রক্ষার কয়েকটি ক্ষেত্রের তালিকা প্রস্তুত করবে।

পাঠ - ৬

শ্রমের মর্যাদা (شَرَفُ الْعَمَلِ)

মানুষ জীবনধারণের জন্য যেসব কাজ করে তাকে শ্রম বলে। মানুষ তার নিজের বেঁচে থাকার, অপরের কল্যাণের এবং সৃষ্টি জীবের উপকারের জন্য যে কাজ করে তাই শ্রম। মানুষের উন্নতির চাবিকাঠিই হলো শ্রম। যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী সে জাতি তত বেশি উন্নত। শ্রমের ব্যাপারে আত্মাহ্ব পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَهِبُوا إِلَى الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

অর্থ : ‘অতঃপর যখন নামাজ শেষ হবে তখন তোমরা জমিনের বৃকে ছড়িয়ে পড়বে এবং আত্মাহ্বর অনুগ্রহ (রিযিক) অন্বেষণ করবে।’ (সূরা আল-জুমুআ, আয়াত ১০)

শ্রমের মর্যাদা :

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা অত্যধিক। শ্রম দ্বারা অর্জিত ঋদ্যকে ইসলাম উৎকৃষ্ট ঋদ্য হিসাবে আখ্যা দিয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণকে ইবাদত হিসাবে ঘোষণা করেছে।

এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন,

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ -

অর্থ : 'ফরয ইবাদতের পর হালাল দুজি উপার্জন করা একটি ফরয ইবাদত।' (বায়হাকি)

মানুষের কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ এ পৃথিবীতে অফুরন্ত সম্পদ রেখেছেন। এ সম্পদগুলো আহরণ করতে হলে প্রয়োজন হয় শ্রমের। শ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোও আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টিগতভাবেই দান করেছেন। এগুলো হচ্ছে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তথা হাত, পা ও মস্তিষ্ক। এগুলোকে কাজে লাগাতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা আলা বলেন- 'তিনি তো তোমাদের জন্য ভূমি সৃষ্ণ করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার দেওয়া রিযিক থেকে আহরণ কর।' (সূরা আল-মুলক, আয়াত ১৫)

আমাদের প্রিয় নবি (স.) শ্রমকে ভালোবাসতেন। তিনি নিজেও শ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি শিশু বয়সে মেঘ চরাতে। বড় হয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। হিজরতের পর মদিনার জীবনে তিনি বিভিন্ন যুগ্ম পরিচালনা করেছেন। বন্দকের যুদ্ধে তিনি পরিখা খননে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পরিশ্রমী ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করেন। শ্রমিকের মর্যাদা সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

الْكاسِبُ حَيْثُ لِلَّهِ -

অর্থ : 'শ্রমজীবী আল্লাহর বন্ধু।' (বায়হাকি)

মহানবি (স.) আরও বলেন, 'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নাই। আল্লাহর নবি দাঁড়ি (আ.) নিজের হাতে কাজ করে যেতেন।' (বুখারি)

প্রিয় নবি (স.)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) নিজ হাতে জীতাখোরাতেন। আর এ জন্য তাঁর হাতে জীতা খুরানোর দাগ পড়ে গিয়েছিল। এমনিভাবে তিনি নিজেই পানির মশক বয়ে আনতেন। এতে তাঁর বুকে দড়ির দাগ পড়েছিল। ঘরের সকল কাজ তিনি নিজে করতেন। নিজে ঝাড়ু দিতেন। সাহাবিগণ এক দিন নবি করিম (স.)-কে জিজ্ঞেস করেন, কোন প্রকার উপার্জন উত্তম? নবি করিম (স.) জবাবে বলেন, 'মানুষের নিজ হাতের কাজের বিনিময় এবং সং ব্যবসায় থেকে প্রাপ্ত মুনাফা।' (সুনানে আহমাদ)

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজে এবং তাঁর সাহাবিগণ জীবিকার জন্য পরিশ্রম করতে লজ্জাবোধ করতেন না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা শ্রমজীবীদের প্রশংসার বলেন, 'এমন বহুলোক আছে যারা জমিনের দিকে অগ্রণ করে ও আল্লাহর অনুগ্রহ বুঁজে বেড়ায়।' (সূরা আল-মুযাফিল, আয়াত ২০)

ইসলামে শ্রমিকের মজুরি সাথে সাথে আদায় করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, 'মজুরের শরীরের ঘাম শূকনের আগ্নেই তার মজুরি আদায় করে দেবে।' (বায়হাকি)

সুতরাং আমরা সবাই শ্রমের প্রতি মর্যাদানীল হব, নিজেদের কাজ নিজেরাই করব এবং আমরা নিজেরা আবলগ্নী হব।

দর্শীয় কাজ : কী কী কাজ শিক্ষার্থী নিজেরা করতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ - ৭

ক্ষমা (الْعَفْوُ)

মহান আল্লাহর অন্যতম গুণ ক্ষমা। সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য মানুষের এ গুণটি থাকা খুবই প্রয়োজন।

ক্ষমার আরবি প্রতি শব্দ 'আফউন' (عَفُو) -এর অর্থ মাফ করা, প্রতিশোধ গ্রহণ না করা। ইসলামি পরিভাষায় এর অর্থ হলো প্রতিশোধ গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নিয়ে মাফ করে দেওয়া।

গুরুত্ব

মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি মানুষকে অনেক নিয়ামত দান করেছেন। মানুষের সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মানুষ তার অজ্ঞতার কারণে সেই সর্বশক্তিমান প্রভুর কথা ভুলে যায়, তাঁর হুকুম অমান্য করে, তাঁর সাথে অংশীদার স্বল্পপন করে। পরে যখন মানুষ নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তখন আল্লাহ মানুষকে ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহর ঘোষণা 'তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পালসমূহ ক্ষমা করেন।' (সূরা-আশ শূরা, আয়াত ২৫)

আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (স.)-কে ক্ষমার নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহ বলেছেন,

حُدِّ الْعَفْوُ وَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

অর্থ : 'আপনি ক্ষমা করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন।' (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১৯৯)

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

অর্থ : 'অতএব, আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' (সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৫৯)

বেসব মানুষ আল্লাহ এবং তাঁর দেওয়া বিধান অমান্য করে, পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয় সর্বশক্তিমান আল্লাহ সেসব বান্দাকে ক্ষমা করে দেন।

ক্ষমার ব্যাপারে মহান রাসূল আলমিনের নীতি ও আদর্শ আমাদের অনুসরণ করা আবশ্যিক। মানুষ ভুলের উর্ধে নর, কোনো কাজে বা কথায় তার ভুল-ত্রুটি হয়ে যেতে পারে। অতএব, অন্যের ভুলত্রুটি, ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে আমাদের দেখা উচিত।

মানুষকে ক্ষমা করলে আল্লাহ খুশি হন এবং যে ক্ষমা করে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। এ সন্দর্ভে আল্লাহ বলেন,

وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ رَّحِيمٌ

অর্থ : 'আর যদি তুমি তাঁদের মার্জনা কর, তাঁদের সোহ-ক্টি উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।' (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত ১৪)

মহানবি (স.) ছিলেন ক্বারম মূর্ত প্রতীক। একবার এক ইয়াজুজি মহিলা প্রিয় নবি (স.)-কে তার বাড়িতে দাওয়াত দেন এবং বিধি মিশ্রিত ছাগলের গোশত তাঁকে খেতে দেন। রাসূল (স.) উক্ত গোশতের কিছু খেতেই বিযক্রিয়া অনুভব করেন। পরে ঐ মহিলা গোশতে বিষ দেওয়ার কথা স্বীকার করে। কিছু প্রিয় নবি (স.) তাকে ক্ষমা করে দেন। এমনিভাবে মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (স.) প্রাণের শত্রুদেরকেও ক্ষমা করে দেন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তোমরা মুক্ত স্বাধীন।’ পৃথিবীর ইতিহাসে এদুগু ক্বারম উদাহরণ আর দ্বিতীয়টি নেই। অপরাধীকে ক্ষমা করলে অপরাধী লজ্জিত হয়ে অপরাধ ছেড়ে দেয়। শত্রুকে ক্ষমা করলে শত্রু বশুতঃ পরিত্যক্ত হয়। আমরা অন্যকে ক্ষমা করব। অন্যকে ভালোবাসব।

দলীল কাজ : শিক্ষার্থীরা ক্বারম হেট হেট ঘটনা যা নিজের জীবনে ঘটেছে, তা নিজের ভাষায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।
বাড়ির কাজ : ক্বারম গুরুত্ব বর্ণনা কর।

পাঠ - ৮

অসদাচরণ (الْأَعْلَاقُ الذَّمِيَّةُ)

এমন কিছু আচরণ বা কাজ যা মানুষকে হীন, নিচু ও নিন্দনীয় করে তোলে, সেগুলোকে আখলাকে যামিমা বা নিন্দনীয় আচরণ বলে। নিন্দনীয় আচরণগুলো হচ্ছে হিংসা, ক্রোধ, লোভ, প্রতারণা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, ইত্যাদি। ইতি টিঙ্কিং, হীনতাই প্রভৃতি। এ নিন্দনীয় আচরণগুলো মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে কলুষিত করে। এ চরিত্রের অধিকারীকে মানুষ ঘৃণা করে। ইহকাল ও পরকালে সে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত হবে। জাহান্নামের নিম্নস্তরে পৌঁছে যাবে। (তাবারানি)

আখলাকে যামিমার কুফল

১. ঘৃণার পাত্র

হীন বা মন্দ চরিত্রের লোকেরা সমাজের কাছে যেমনিভাবে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়, তেমনিভাবে পরিবারের কাছেও ঘৃণিত হয়। পরকালেও সে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত হবে। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, ‘বান্দা তার কুচরিত্রের কারণে জাহান্নামের নিম্নস্তরে পৌঁছে যাবে।’ (তাবারানি)

২. জান্নাত থেকে বঞ্চিত

মন্দ চরিত্রের লোকেরা পরকালে জান্নাত লাভ করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَاطُ وَلَا الْجَنْظَرِيُّ

অর্থ : ‘দুচরিত্র ও রূঢ় সুভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।’ (আবু দাউদ)

চরিত্র সংশোধন ব্যতীত আত্মার সংশোধন সম্ভব হয় না। এ জন্য চরিত্রিক দুর্বলতার সব দিকগুলোর সংশোধন করা আবশ্যিক।

দলীল কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে অসদাচরণের কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ - ৯

হিংসা (الْحَسَدُ)

অন্যের সুখ-সম্পদ, মানসম্মান নষ্ট হওয়ার কামনা এবং নিজে এর মালিক হওয়ার বাসনা করাকে হিংসা বলে। হিংসা শব্দের আরবি প্রতিশব্দ ‘হাসাদুন’ (حَسَدٌ), যার অর্থ হিংসা, ইর্ষা, পরদ্রোহিতারতা ইত্যাদি।

অপকারিতা

হিংসা একটি মারাত্মক মানসিক ব্যাধি। হিংসা বহু কারণে সৃষ্টি হয়। যেমন: শত্রুতা, লোভ, অহংকার, নিজের অসৎ উদ্দেশ্য নষ্ট হওয়ার অশঙ্ক, নেতৃত্বের লোভ ইত্যাদি। এসব কারণে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ করে থাকে। ইসলাম এ কাজগুলোকে হারাম ঘোষণা করেছে। হিংসার অপকারিতা সীমাহীন। হযরত আদম (আ.)-এর মর্যাদা দেখে ইবলিস তার প্রতি হিংসা করে। ফলে সে অভিশপ্ত হয়। আদ্বাহ তাআলার দয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

মানব সৃষ্টির পর হিংসার কারণেই সর্বপ্রথম পাপ সংঘটিত হয়। আদম (আ.)-এর পুত্র কাবিল হিংসার বশবর্তী হয়ে তারই আপন ভাই হাবিলকে হত্যা করে। হিংসা মানুষের ভালো কাজগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেছেন,

إِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ -

অর্থ: ‘আগুন যেমন শুকনা কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়, হিংসা তেমনই পুণ্যকে ধ্বংস করে দেয়’। (ইবনে মাজাহ)

হিংসা মানুষের শান্তি বিনষ্ট করে। মনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখে। হিংসুক ব্যক্তি আদ্বাহ এবং মানুষের কাছে ঘৃণিত। কেউ তাকে ভালোবাসে না। কেউ তাকে বশু হিসেবে গ্রহণ করে না। সমাজের লোকেরা তাকে এড়িয়ে চলে। হিংসা সমাজে ঝগড়া-মতাসাদ, মারামারি এবং অশান্তি সৃষ্টি করে। মানুষের মনে অহংকার সৃষ্টি হয়। অহংকার মানুষের পতন ঘটায়।

আদ্বাহ তাআলা কুরআন মজিদে হিংসা থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আদ্বাহ বলেন,

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

অর্থ: ‘আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে অশ্রয় চাই যখন সে হিংসা করে।’ (সূরা আল-ফালাক, আয়াত ৫)

আদ্বাহ তা আলা হিংসা বর্জনকারীকে ভালোবাসেন। হিংসা বর্জনকারী জান্নাত লাভ করবেন। শ্রিয় নবি একবার তাঁর এক সাহাবিকে জান্নাতি বলে ঘোষণা দেন। তিনি কী অমল করেন এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, আদ্বাহ তাআলা যাকে কোনো উত্তম বস্তু দান করেছেন আমি তার প্রতি কখনই হিংসা পোষণ করি না। (ইবনে মাজাহ)

আমাদের প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত ‘আমরা হিংসা করব না। নিজের ক্ষতি করব না। সমাজের শান্তি বিনষ্ট করব না।’

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা হিংসার কুফলের একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ - ১০

ক্রোধ (الْغَضَبُ)

'ক্রোধ' এর আরবি প্রতিশব্দ 'গাদাব'(عَضَبٌ), যার অর্থ রাগ। আর্য শব্দ ক্ষুব্ধ হওয়া বা কারো দ্বারা তিরস্কৃত হওয়ার কারণে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় মানুষের মনের মধ্যে যে কোভের সৃষ্টি হয়, তাকে ক্রোধ বলে। অহংকার, তিরস্কার, ঝগড়া প্রভৃতি কারণে ক্রোধের সৃষ্টি হয়।

ক্রোধ ও রাগের ফলে মানুষ অনেক নির্দয় ও অত্যাচারমূলক কর্মকাণ্ড করে ফেলে। পরবর্তিতে এর কারণে লজ্জিত ও অবজ্ঞার পাশ্বে পরিণত হয়। তাই মুসলমানদের উচিত ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করা। এ বিষয় মহানবি (স.) বলেন,

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ -

অর্থ : 'শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয়, যে খুব ক্রুদ্ধ লড়তে পারে। বরং প্রকৃত শক্তিশালী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে।' (বুখারি ও মুসলিম)

অপকারিতা

ক্রোধ একটি নিন্দনীয় বিষয়। এটি মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আর হিংসা মানুষের সৎকর্মসমূহ শেষ করে দেয়। ক্রোধের সময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। ক্রোধ মানুষের ইমানকে ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, 'সিরকা মধুকে যেভাবে বিনাশ করে, ক্রোধও ইমানকে অদ্রুপ নষ্ট করে।' (বায়হাকি)

ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আত্মাহ্বের গযব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রিয় নবির সাহাবি হযরত ইবনে উমার (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে জানতে চাইলেন, এমন কোনো কাজ আছে যা আত্মাহ্ব তাআলার গযব থেকে রক্ষা করবে? রাসুল (স.) বলেন, 'তুমি রাগ করবে না।' (ভাবারানি)

ক্রোধ সংবরণ করা একটি পুণ্যের কাজ। রাসুল (স.)-এর এক সাহাবি একবার রাসুল (স.)-কে বললেন, 'হে আত্মাহ্বের রাসুল, আপনি আমাকে একটি ভালো কাজের নির্দেশ দিন।' প্রিয় নবি (স.) তাকে বললেন 'তুমি রাগ করবে না।' (বুখারি)

মহানবি (স.) বলেছেন, ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে, শয়তান আগুনের তৈরি। আর আগুনকে পানি ঠাণ্ডা করে। যদি কারও রাগ হয়, তবে তার উচিত ওয়ু করে নেওয়া। (বুখারি ও মুসলিম)

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ক্রোধ পরিহারের উপায়গুলো বের করবে এবং পোস্টারে লিখে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

বাড়ির কাজ : 'ক্রোধ একটি নিন্দনীয় বিষয়'-ব্যাখ্যা কর।

পাঠ - ১১

লোভ (الْحِرْصُ)

লোভ এর আরবি প্রতিশব্দ 'হিরছুন' (حِرْصٌ), এর অর্থ লালসা, লিপ্সা, মোহ, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা ইত্যাদি। অধিক পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে লোভ বলে। যেমন অর্থ-সম্পদের লোভ, পদমর্যাদার লোভ, খাদ্যদ্রব্যের লোভ, পোশাক-পরিচ্ছদের লোভ ইত্যাদি।

লোভের কুফল

লোভ মানুষের মনের শক্তি বিনষ্ট করে। অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে সারাক্ষণ বিত্তের রাখে। ফলে নিজের কাছে যা আছে তাতে তুষ্ট না থেকে আরও পাওয়ার আশায় সে অস্থির থাকে।

লোভ মানুষকে নানা প্রকার অপরামূলক কাজের দিকে ধাবিত করে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, কালোবাজারি, মজুদদারি, দ্রব্য ভেজাল দেওয়া, সুদ-মুখ খাওয়া ইত্যাদি অপরামূলক কাজ লোভের কারণেই সংঘটিত হয়।

লোভী ব্যক্তি অন্যের ধন-সম্পদের প্রতি লোভুশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং অবৈধ উপায়ে তা হস্তগত করার চেষ্টা করে। ইসলামে এতুপ লোভকে নিষিদ্ধ করেছে। শ্রিয় নবি (স.) বলেছেন- 'তোমরা লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা এই জিনিসই তোমাদের পূর্বজীদেরকে ধ্বংস করেছে এবং পরস্পরকে রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে উৎসেক দিয়েছে। আর এই লোভ লালসার কারণেই তারা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করেছে।' (সহিহ মুসলিম)

খাদ্যের প্রতি লোভে অনেকে মাদ্রাতিরিক্ত খায়। এতে সে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আবার কখনো তা তার জীবন নাশেরও কারণ হয়। আর তাই কথায় বলে, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।'

লোভ থেকে বাঁচার উপায়

ঐর্ষ্য এবং অজে তৃষ্টির গুণ থাকলে লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকা যায়। রাসূল (স.) বলেছেন, 'ইমান এবং লোভ এক অন্তরে একত্রিত হতে পারে না, কেননা ইমানের পরিণাম হচ্ছে ঐর্ষ্য, তাওয়াক্কুল এবং অজে তৃষ্টি থাকা।' (নাসাই ও তিরমিযি)

তাকদিরের ওপর বিশ্वास রাখা লোভ দমনের প্রধান উপায়। মহানবি (স.) বলেন, 'হে মানবমজলী! তোমরা তাওয়ারর ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা অবলম্বন কর। কেননা বাদার ভাণ্ডো বা নির্ধারিত আছে তার অতিরিক্ত সে পাবে না।' (হাকিম)

জীবনব্যাপনের ক্ষেত্রে সহজ-সরল পথ অবলম্বন করলে লোভ বর্জন করা সম্ভব হয়। আমাদের লোভের কুফল জানব। লোভ বর্জন করব। তাকদিরে বিশ্वास করব। অজে তৃষ্টি থাকব। নিজেরা সুখে থাকব। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব।

দলীল কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে লোভের কুফল আলোচনা করে লোভ বর্জনের উপায়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ - ১২

প্রতারণা (الْفُتْنُ)

প্রতারণার আরবি প্রতিশব্দ ‘অল-গাসসু’ (الْفُتْنُ) যার অর্থ ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া, প্রবঞ্চনা ও বোকা। কথাব্যর্তী, আচার-আচরণ, সেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বোকা দেওয়াকে প্রতারণা বলে। পঞ্চসুব্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে বিক্রি করা, অজ্ঞীকার ভজা করা ইত্যাদি প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত।

কুফল

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতারণা একটি মানবতাবিরোধী অতি গর্হিত কাজ। এটি মিথ্যার শামিল। ইসলাম সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণকে সমর্থন করে না। কুরআন মজিদে ঘোষণা করা হয়েছে,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থ : ‘তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ করো না এবং তোমরা জেনে-তনে সত্যকে গোপন করো না।’ (সূরা আল-বাকার-আয়াত ৪২)

প্রতারণা একটি সামাজিক অপরাধ। কারণ এর ফলে মানুষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। প্রতারণাকারী খাঁটি মুসলমান নয়। আমাদের নবি (স.) একদিন বাজারে গিয়ে খাদ্যসুব্যের একটি বড় স্তূপ দেখতে পান। স্তূপটির উপরিভাগের সুব্য শুকনো ছিল। কিন্তু স্তূপটির ভেতরের অংশও শুকনো আছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তখন তিনি ভিতরের অংশ ভিজা দেখতে পেলেন। রাসুলুল্লাহ (স.) মালিকের কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। মালিক জানাল তাকে বুস্তির পানি লেগেছে। তখন রাসুল (স.) তাকে বললেন, তুমি ভেজা খাদ্য উপরে রাখলে না কেন? যাতে লোকেরা তা দেখতে পেল?

এ প্রসঙ্গে মহানবি বললেন,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

অর্থ : ‘যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়’ (মুসলিম)

প্রতারণা মূলফিকের কাজ। এর শাস্তি বড় কঠিন। সত্যিকার ইমানদার ব্যক্তি কখনই প্রতারণার আশ্রয় নেয় না। মানুষকে বোকা দেয় না। অজ্ঞীকার ভজা করে না।

আমরা প্রতারণা করব না। মানুষকে বোকা দেব না। অজ্ঞীকার ভজা করব না।

দশীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে প্রতারণার কুফল আলোচনা করবে এবং
এগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

বাড়ির কাজ : তুমি বা তোমার পরিবারের কেউ প্রভাবিত হয়ে থাকলে সে ঘটনা সংক্ষেপে লিখ।

পাঠ - ১৩

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া (عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া বলতে বুঝায়, তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান না করা। পিতা-মাতার কথামত না চলা, তাঁদের নির্দেশ অমান্য করা। আদ্বাহর অনুগ্রহের পর সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার অনুগ্রহ সবচেয়ে বেশি। তাঁরা সন্তানের আপনজন। তাঁদের স্নেহ-মমতায় সন্তান লালিত-পালিত হয়। সন্তানের আদাম আয়েশের জন্য তাঁরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাঁরা সব রকম ব্যবস্থা করেন। কাজেই সন্তানের কর্তব্য হলো পিতা-মাতার বাধ্য থাকা।

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া জঘন্য অপরাধ। এর অপকারিতা অনেক।

অপকারিতা

১. শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।

২. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার পাপ এত ভয়াবহ যে স্বয়ং আদ্বাহ তাআলা এ পাপ ক্ষমা করেন না। এ বিষয় রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘মহান আদ্বাহ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সকল পাপই ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার পাপ তিনি ক্ষমা করেন না।’ (বায়হাকি)

৩. পিতা-মাতার অবাধ্য হলে পরকালে জাহান্নামের কঠিন আগুনে জ্বলতে হবে।

এ বিষয় রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘তাঁরাই (পিতা-মাতা) তোমার বেহেশত ও দোষখ।’ (ইবন মাজাহ)।

অর্থাৎ পিতা-মাতার সন্তুষ্টির ওপর যেমন সন্তানের জাহান্নাত লাভ নির্ভর করে, ঠিক তেমনি তাঁদের অসন্তুষ্টির কারণে সন্তান দোষখবাসী হবে। নবি করিম (স.) আরও বলেন, ‘তার সর্বনাশ হোক, তার সর্বনাশ হোক।’ তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আদ্বাহর রাসুল! সে কে? তখন তিনি বললেন, ‘যে ব্যক্তি পিতা-মাতার যেকোনো একজনকে অথবা উভয়কে বৃশ অবস্থায় পেল, তবুও সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারল না।’ (মুসলিম)

৪. মাতার অবাধ্য হওয়াকে আদ্বাহ তাআলা হারাম ঘোষণা করেছেন।

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘আদ্বাহ তোমাদের জন্য মায়েরদের অবাধ্য হওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন।’ (সহিহ বুখারি)

৫. পিতা-সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট হলে আদ্বাহ তাআলাও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘পিতার সন্তুষ্টিতে আদ্বাহর সন্তুষ্টি। আর পিতার অসন্তুষ্টিতে আদ্বাহর অসন্তুষ্টি।’ (তিরমিযি)

পিতা-মাতা সন্তানের কল্যাণেই কখনো তাঁদের শাসন করেন বা কাড়া কথা বলেন। এটা সন্তানকে মেনে নিতে হবে। এতে তার ভবিষ্যৎ সুখময় হবে।

অমরা পিতা-মাতার আদেশ-নিষেধ মেনে চলব। এটি মানবিক দায়িত্ব। এতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন। আদ্বাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

দলীল কাছ : শিকারীরা ৪/৫টি দলে ভাগে হয়ে পিতা-মাতার অবাধ্যতার পরিণতি কী তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ - ১৪

ইভটিজিং (إِثَارَةُ النِّسَاءِ)

ইভটিজিং শব্দটি ইভ (Eve) ও টিজিং (Teasing)-এর একত্রিতব্দ। বাইবেল অনুসারে প্রথম নারীর নাম ইভ (Eve)। এখানে 'ইভ' বলতে নারী সমাজকে বুঝানো হয়েছে। আর 'Tease' অর্থ পরিহাস, ছালাতন করা, উত্তাক্ত করা, বেশানো। ইভটিজিং বলতে কথা, কাজ, আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে নারীদের উত্তাক্ত করাকে বুঝানো হয়েছে। নারীদের প্রতি অশালীন উক্তি করা, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা ইভটিজিংয়ের অন্তর্ভুক্ত।

১৯৭৬ সালে প্রণীত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অভিন্যাস এ ইভটিজিং কে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যাতে বলা হয় যে, রাস্তা বা জন সম্মুখে কোন নারীকে অশোভন শব্দ, অঙ্গভঙ্গি ও মন্তব্যর মাধ্যমে যৌন উৎসাহিত করা ইভটিজিং হিসেবে গণ্য হবে।

অপকারিতা

ইভটিজিং একটি সামাজিক ব্যাধি। নারীদেরকে উত্তাক্ত করা, কাটকে মন্দনামে ডাকা বা উপহাস করা গর্হিত কাজ। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ط بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ

وَمَنْ لَّمْ يَدَّبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থ : 'তোমরা একে অন্যের প্রতি সোধারোল করবে না এবং একে অপরকে মন্দনামে ডাকবে না। ইমান গ্রহণের পর মন্দনামে ডাকা বড় ধরনের অপরাধ। যারা তওবা না করে তারাই যালিম'। (সূরা আল-হুজরাত, আয়াত ১১)

বর্তমানে প্রায়ই স্কুল-কলেজের সামনে, রাস্তার মোড়ে, গলির মুখে কিছু বখাটে ছেলে দাঁড়িয়ে মেয়েদেরকে উত্তাক্ত করে। এর ফলে অনেক মেয়ে নিরাপত্তাহীনতার ভোগে, প্রয়োজনীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। কেউ কেউ আবার আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। এতে সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়। সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। জাতি ধর্মের দিকে ধাবিত হয়।

প্রতিকার

১৯৭৬ সালে প্রণীত বাংলাদেশ আইনে ইভটিজিং একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়েছে। এর শাস্তি হিসাবে সর্বোচ্চ ১ বছর কারাদণ্ড অথবা দুই হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে।

পারিবারিক অনুশাসন, ধর্মীয় শৃঙ্খলা, সামাজিক সচেতনতা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

আমরা ইভটিজিংয়ের মতো খারাপ কাজ করব না। আমরা সব সময় ভদ্র, নম্র, শালীন আচরণ করব। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করব।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা ইভটিজিংয়ের ফলে কী কী সামাজিক ক্ষতি হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

বাড়ির কাজ : সমাজে ইভটিজিং প্রতিরোধ করতে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ - ১৫

হিনতাই (الْإِنْتِهَاءُ)

জোরপূর্বক বা বল প্রয়োগ করে অন্যের সম্পদ হিনিয়ে নেওয়ারকে হিনতাই বলে। হিনতাই একটি সমাজবিধেয়ী কর্মকাণ্ড। এতে সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়। মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। নিরাপত্তাহীনতায় থাকে।

কুফল

হিনতাই একটি জঘন্য সামাজিক অনাচার। এটি চুরি-ডাকাতি অপেক্ষা মারাত্মক। হিনতাই সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে। সামাজিক নিরাপত্তা বিধ্বস্ত করে। এর ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। মানুষের মূল্যবান অর্থ সম্পদের নিরাপত্তা বিধ্বস্ত হয়। ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

হিনতাইকারী দুনিয়াতে ও আখিরাতে নির্মম শাস্তি ভোগ করবে। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ -

অর্থ: 'যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ জমি হিনতাই করে, কিয়ামতের দিন সাতগুণ জমি তার গলায় বেড়িয়ে খুলিয়ে দেয়া হবে।' (সহি বুখারি ও মুসলিম)

যে হিনতাই করে তার পূর্ণ ইমান থাকে না। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, 'কোনো ব্যক্তি প্রকাশ্যে হিনতাই ও চুটতরাজ করলে সে মুমিন থাকে না'।

হিনতাই বর্বর যুগের চরিত্রবিশেষ। ইসলাম এ বর্বরতাকে সমূলে উৎপাটন করার লক্ষ্যে ঘোষণা করেছে,

لَا ظَرْوَ وَلَا ظِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ

অর্থ: 'ইসলামি বিধানে না নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নিয়ম আছে, না অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার নিয়ম আছে'।

পবিত্র কুরআন মাজিদে এবং মহানবি (স.)-এর হাদিসে হিনতাই, ডাকাতি, চুটতরাজ ইত্যাদি অপকর্মের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রতিকার

এ ধরনের সামাজিক অপরাধ, অনাচার, অত্যাচার থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। সে জন্য সামাজিক সচেতনতা প্রয়োজন।

মানুষকে হিনতাই এর কুফল সম্পর্কে সচেতন করা এবং কুরআন ও হাদিসের আলোকে এর অপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন।

অপরার্থীদেরকে এরূপ সামাজিক অনাচার থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে আইনের হাতে গোপদ করিতে হবে।

সৃষ্ট বিচারব্যবস্থা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে এ ধরনের অনাচার সমাজ থেকে দূর হবে।

আমরা হিনতাইয়ের কুফল অনুধাবন করব। এ ধরনের জঘন্য কাজে লিপ্ত হব না। এ জঘন্য কাজ যারা করে তাদেরকে এ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করব।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে হিনতাইয়ের কুফল আলোচনা করে এর প্রতিকারের উপায়গুলো পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

সূন্যস্থান পূরণ কর

১. প্রশংসনীয় মাধ্যমেই উত্তম চরিত্র গড়ে ওঠে।
২. পরোপকারের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়।
৩. শালীনতা মানুষের অপরিহার্য বিষয়।
৪. মানুষের ওপর প্রধানত ধরনের কর্তব্য রয়েছে।
৫. সমাজের প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ দায়িত্ব তার নিকট পবিত্র।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. আত্মপাকে যামিমাহ হচ্ছে	গঞ্জিত রাবা
২. আমানত অর্থ	সামাজিক অপরাধ
৩. সকল সৃষ্টিই আল্লাহ তাআলার	নিকৃষ্ট চরিত্র
৪. প্রত্যক্ষণা একটি	পরিচ্ছদ

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পরোপকারের পাঁচটি সুফল লিখ।
২. আমানত রক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৩. ক্রোধের ক্ষতিকর অবস্থা ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আমার নিকট শ্রিয়, যার চরিত্র সর্বোত্তম' – হাদিসটির ব্যাখ্যা লিখ।
২. 'অশালীন পোশাক ও আচরণ' বিপর্যয় ডেকে আনে, উদাহরণসহ লিখ।
৩. ক্ষমার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৪. 'লোভের কারণেই যত বিপর্যয়' – উক্তিটির ব্যাখ্যা করে লোভ থেকে মুক্তির পাঁচটি উপায় বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কোন যুদ্ধে বিজয়ের পর ইয়াহুদি মহিলা মহানবি (স.)-কে বিষ মিশ্রিত গোশত খেতে দেয়?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. বদর | খ. উহুদ |
| গ. খাইবার | ঘ. হুনাইন। |

২. 'নামায শেষে তোমরা জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড়।' আত্মাহ তায়ালার এ নির্দেশের উদ্দেশ্য কী?

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ক. শ্রমের ফজিলত বর্ণনা করা | খ. নামাযের গুরুত্ব আলোচনা করা |
| গ. শ্রমের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা | ঘ. শ্রমের গুরুত্ব বর্ণনা করা। |

৩. শাঙ্গীনতার গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ তা মানুষকে -

- i. আত্মাহর অনুগত বান্দা হতে সাহায্য করে
- ii. পরিবেশের প্রতি সদাচরণে সহায়তা করে
- iii. অন্যায় ও অশ্রীল কাজ থেকে বিরত রাখে

কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাবির আবিরের নিকট একটি বই জমা রাখল। দুই দিন পর ফেরত চাইলে আবির বইটি ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়।

৪. আবিরের ঘাৱা কী লজিত হয়েছে?

- | | |
|--------|------------|
| ক. আহদ | খ. আমানত |
| গ. আদল | ঘ. তাহসিব। |

৫. আবিরকে বলা যায় -

- | | |
|-----------|------------|
| ক. মুশরিক | খ. মুনাফিক |
| গ. ফাসিক | ঘ. কাফির। |

সুজনশীল প্রশ্ন

১। শিক্ষপতি জামিল সাহেব তাঁর গার্হস্থ্যে কর্মচারীদের যথাসময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পরিশোধ করেন। তিনি সততার সাথে কাজ করতে এই বলে সতর্ক করে দেন, যেন তার কারখানায় তৈরি পোশাকে কোনোরকম সমস্যা না থাকে। কাপড় কম দেওয়া বা সেলাইয়ে সুতা যেন খারাপ না হয়। তারপরেও এক কর্মচারী ইচ্ছাকৃতভাবে কাপড় কম দিয়ে পোশাক তৈরি করে। ঐ কর্মচারী কাপড় কম দেওয়ার বিষয়টি গোপন রাখে। এতে জামিল সাহেবের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে জামিল সাহেব ঐ কর্মচারীর বেতন বাতিল করে দেন। একপর্যায়ে সামান্য বেতনের ঐ কর্মচারীর পারিবারিক সমস্যার কথা বুঝলে জামিল সাহেব কর্মচারীকে আত্মীয় কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে বলেন।

ক. ক্ষমা এর আরবি প্রতিশব্দ কী?

খ. শ্রমের মর্যাদা বলতে কী বোঝায়?

গ. জামিল সাহেবের সর্বশেষ আচরণে যে গুণটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সুদৃষ্ট কর্মচারীর কর্মকাণ্ড একটি সামাজিক অপরাধ'-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

২। জহির সাহেব একজন চরিত্রবান লোক। রজব মিয়া তাঁর বাড়িতে মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে কাজ করে টাকাগুলো জহির সাহেবের নিকটই জমা রাখেন। এভাবে দু'বছর কাজ করার পর ঢাকা শহরে বেড়াতে এসে নিব্বোজ হন। এ অবস্থায় জমানো টাকা দিয়ে জহির সাহেব তার এলাকায় এক বিধা জমি ক্রয় করে রজব মিয়ার নামে কওলা করেন। দীর্ঘ দশ বছর পরে রজব মিয়া জহির সাহেবের বাড়িতে ফিরে আসলে, জহির সাহেব তাঁর জমির দলিল হাতে দিয়ে জমি বুঝিয়ে দেন। অপর দিকে আরমান সাহেবের ড্রাইভার রমিজ মিয়া বিদেশে যাওয়ার জন্য জমি বিক্রি করে আরমান সাহেবের নিকট দুই লাখ টাকা দেন। আরমান সাহেব তাকে বিদেশে পাঠানোর কথা বলে একটি জাল ভিসা তৈরি করে দেন। রমিজ মিয়া এর মাধ্যমে বিদেশে যেতে বার্ষিক হয়ে টাকা ফেরত চাইলে আরমান সাহেব বলেন, তোমাকে ভিসা দেওয়া হয়েছে, কাজেই তুমি বিদেশে যেতে না পারার দায়ভার আমি বহন করব না।

ক. কী কারণে মনের শক্তি নষ্ট হয়?

খ. অখেলাকে যামিমা বলতে কী বোঝায়?

গ. জহির সাহেবের কাজটির মাধ্যমে কোন বিষয়টি রক্ষা পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ড্রাইভার রমিজ মিয়ার সাথে আরমান সাহেবের আচরণ বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করলেই মানুষ সেরা হতে পারে। যে জীবন অনুসরণ ও অনুকরণ করলে মানুষের জীবন সুন্দর ও সফল হয়, তাকে আদর্শ জীবন বলে। আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে যে সব নবি ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের জীবনই আমাদের জন্য আদর্শ। এমনভাবে যেসব মনীষী, নবি ও রাসূলগণের পথ অনুসরণ করেছেন তাঁরাও আদর্শ মানুষ। তাঁদের জীবনের ভালো দিকগুলো আমাদের আদর্শ।

এ অধ্যায় শেষে আমরা

- আদর্শ জীবন চরিত অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হযরত ইসমাইল (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.), হযরত মুহাম্মদ (স.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলি (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে পারব।
- মনীষীগণের গুণাবলি যেমন- সমাজসেবা, সাম্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আত্মত্যাগ, সহমর্মিতা, পরমভস্মিহুতা, সৌহার্দ, মানবিকতা, আধ্যাত্মিকতা, ত্যাগ, ক্ষমা, অসাম্প্রদায়িক সৃষ্টিভঙ্গি, ন্যায়বিচার, দানশীলতা, পরোপকারিতা, দেশপ্রেম, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে তাঁদের অবদান ও শিক্ষা ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করতে পারব।
- বাস্তব জীবনে মনীষীগণের গুণাবলি অনুসরণ করে আদর্শ জীবন গঠনের উপায় বলতে পারব।
- দলগত কাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার উপায় এবং সামগ্রিকভাবে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ - ১

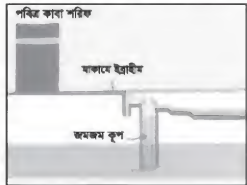
হযরত ইসমাইল (আ.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত ইসমাইল (আ.) ছিলেন আল্লাহর নবি। তিনি হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তার মাতার নাম হাজিরা (আ.)। তিনি খ্রিষ্ট পূর্ব ১৯১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর বয়স ছিল ৮৬ বছর। তিনি কুরাইশ ও উত্তর আরবের 'আদনান' বংশের আদি পিতা।

নির্বাসন ও জন্মকর্ম কৃপা সৃষ্টি

হযরত ইসমাইল (আ.)-এর জন্মের কিছুদিন পর তাঁর পিতা হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর নির্দেশে তাঁকে ও তাঁর মাতাকে নির্জন ভূমিতে রেখে আসেন। তিনি তাঁদেরকে কিছু খেজুর ও এক মশক পানি দিয়ে আসেন এবং তাঁদের জন্য এ বলে দোয়া করেন- “হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালুম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকটে। হে আমার প্রতিপালক! এ জন্য যে তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা



করে। অতএব তুমি কিছু স্নানকর অন্তর তাঁদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাঁদের রিজিকের ব্যবস্থা কর, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।'

(সূরা ইবরাহিম, আয়াত ৩৭)

অল্প কিছুদিন পর তাঁদের খাবার ফুরিয়ে যায়। শিশু ইসমাইল পানির পিপাসায় কাতর হয়ে ওঠেন। তার চিৎকারে মা হাজিরা (আ.) অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি পানির সন্ধানে সাফল্য ও মারওয়া পাছাড়ের সাতবার ছোটোছুট করেন। কিন্তু কোথাও পানি পেলেন না। অবশেষে ফিরে এসে সেখানে পানি শিশু ইসমাইলের পদাঘাতে আত্মাহুত হুকুমে সে স্থানে পানির প্রোত্বেদ্য প্রবাহিত হচ্ছে আর এটাই হলো জব্বার কূপের উৎস। হযরত হাজিরা (আ.) এই কূপ থেকে নিজে পানি পান করেন এবং তাঁর শিশু পুত্রকেও তা পান করান। আত্মাহুত শুকরিয়া আদায় করেন। এই কূপকে কেন্দ্র করে জব্বার গোত্র সেখানে বসবাস শুরু করে। এ গোত্রে হযরত ইসমাইল (আ.) বিবাহ করেন। কুরাইশ গোত্র এ গোত্রের একটি শাখা।

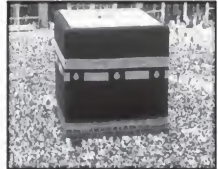
কুরবানি

আত্মাহুত দ্বারা হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। হযরত ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি করার নির্দেশ ছিল একটি পরীক্ষা। একদা হযরত ইবরাহিম (আ.) সিরিয়া থেকে বিবি হাজিরা ও পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে সেখানে মক্কার গমন করেন। তখন হযরত ইবরাহিম (আ.) স্বপ্নবোধে পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি করতে আদিষ্ট হন। তখন ইসমাইলের বয়স ছিল ১৩ বছর। অজ্ঞাত হয়ে হযরত ইবরাহিম (আ.) পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে বলেন: 'হে পুত্র! স্বপ্নে দেখলাম আমি তোমাকে কুরবানি করছি। তুমি কী বল?' তখন পুত্র ইসমাইল কোনোমুহুরে বিচলিত না হয়ে আমনদ দিয়ে উত্তরে বলেন, 'হে পিতা! আপনি যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। ইনশাআল্লাহ আমাকে আপনি ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন।' (সূরা আস-সাফফাত, আয়াত ১০২)

হযরত ইবরাহিম (আ.) পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি করার উদ্দেশ্যে 'মিনা'র পথে রওজানা হলেন। পথিমধ্যে শয়তান ইসমাইল (আ.)-কে বারবার প্রতারণিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হয়ে নির্বিক্রে মিনায় পৌছেন। হযরত ইবরাহিম (আ.) প্রাণ-প্রিয় পুত্রকে কুরবানি করার জন্য উদ্যত হলেন। এমন সময় আত্মাহুতর পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহিম (আ.) আওরাজ শুনতে পেলেন, 'হে ইবরাহিম! তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছে। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।' (সূরা আস-সাফফাত, আয়াত ১০৫) অলৌকিকভাবে পুত্র ইসমাইল (আ.)-এর স্মরণে একটি দুধা কুরবানি হয়ে গেল আর ইসমাইল (আ.) দুধার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এ ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের এ গল্প কুরবানি। কুরবানি করা ওয়াজিব।

কাবাগৃহ নির্মাণ

হযরত ইসমাইল (আ.)-এর পিতা হযরত ইবরাহিম (আ.) আত্মাহুতর হুকুমে তাঁরই প্রদর্শিত স্থানে প্রথম কাবাধর পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আত্মাহুত বলেন-‘স্মরণ কর! যখন ইবরাহিম ও ইসমাইল কাবাধরের প্রাচীর তুলে ছিল, তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বপ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত’। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১২৭) হযরত ইবরাহিম (আ.) পাথরের গাঁথনি লাগাতেন আর ইসমাইল (আ.) তাকে পাথর তুলে দিতেন। দীর্ঘ সময় ধরে পিতা-পুত্র কাবাধর নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করেন।



উপাধি লাভ

হযরত ইসমাইল (আ.) ছিলেন ঐর্ষশীল ও পিতাভক্ত। আত্মাহ ত্যাগা তাঁকে 'ছাদেকুল ওয়াদ' (অজীকার পালনকারী) উপাধিতে ভূষিত করেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে অজীকার করেছেন: অমুক স্থানে তার জন্য অপেক্ষা করবেন, লোকটি কথা অনুযায়ী সে স্থানে না আসলেও তিনি তার জন্য তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকেন এবং তৃতীয় দিন তার সাথে দেখানে দেখা হয়। (ইবন কাহির)

নিজের ওয়াদা রক্ষার জন্য তিন দিন পর্যন্ত কষ্ট করে অপেক্ষা করেছিলেন বলে হযরত ইসমাইল (আ.)-কে আত্মাহ ছাদেকুল ওয়াদ বা অজীকার পালনকারী উপাধি দান করেছিলেন।

হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশেই জন্মগ্রহণ করেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। হযরত ইসমাইল (আ.) একশত ছত্রিশ বছর বয়সে মক্কা নগরীতে ইন্তিকাল করেন। হযরত ইসমাইল (আ.) কর্তৃক আত্মাহর প্রতি অনুগত্য, পিতৃভক্তি, ভাণ্ড, অজীকার পালন ইত্যাদি আমাদের জীবনের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

দলীল কাছ : শিকারীরা শ্রেণিককে হযরত ইসমাইল (আ.)-এর কুরবানির কাহিনী ও জমজমের উৎপত্তির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করবে।

পাঠ - ২

হযরত ইউসুফ (আ.)

পরিচয়

হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন আত্মাহর নবি। তাঁর পিতার নাম হযরত ইয়াকুব (আ.) আর মাতার নাম রাহীলা বিনতে লাবন। তিনি হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর একাদশতম পুত্র। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ১৯২৭-১৮১৭-এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কেনানের অধিবাসী। শারীরিক গঠনে অশূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী। আর ব্যবহারে বিনয়ী ও উত্তম চরিত্র গুণে গুণাবিত। পবিত্র কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীকে 'আহসানুল কাসাস' (সর্বোত্তম কাহিনী) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যড়যন্ত্রের কবলে হযরত ইউসুফ (আ.)

হযরত ইয়াকুব (আ.) স্বীয় পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.)-কে অনেক আদর করতেন। এতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর বিন ইয়ামিন ব্যতীত অন্যান্য বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। তারা তাঁর ব্যাপারে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর অনুমতি নিয়ে একদিন তারা তাঁকে খেলার কথা বলে নির্জন একটি মাঠে নিয়ে যায়। সেখানে তারা তাঁকে মারধর করে একটি গভীর কূপে নিক্ষেপ করে। বাড়িতে ফিরে এসে তাঁরা পিতাকে বলে, আমরা যখন খেলাশুলা করছিলাম তখন একটি বাঘ এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং খেয়ে ফেলে। সেদূর এই যে তাঁর রক্তমাথা জামা-কাপড়। কিন্তু হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁদের কথায় বিশ্বাস করলেন না, বরং মর্মান্বিত হলেন। তিনি ক্রোধ প্রকাশ না করে ঐর্ষধারণ করে বললেন, 'যেই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আত্মাহ আমার সাহায্যস্বল'। (সূরা ইউসুফ, আয়াত ১৮)

ক্লীতদাস হিসেবে বিক্রয়

একটি বণিকদল ঐ কূপের পাশ দিয়ে মিসরে যাচ্ছিল। আত্মাহর ইচ্ছায় দলটি কূপের ধারে এসে থামল। তাঁরা পানির জন্য কূপের ভিতরে লাগড় ফেললে হযরত ইউসুফ (আ.) লাগড়ের রশি ধরে উপরে উঠে আসেন। তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দেখে বিমিত হয়ে বলল, 'কী সুববর! এ যে এক কিশোর। অত্যাশ্র তাঁরা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল'।

(সূরা ইউসুফ, আয়াত ১৯)। তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মিসরে দাস হিসেবে বিক্রি করে। মিসরের শাসক আজিজ তাঁকে স্বল্প মূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের (মুদ্রা) বিনিময়ে ক্রয় করেন। তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পুত্রের মতো ভালোবাসতে থাকেন। হযরত ইউসুফ (আ.) যুবক বয়সে মিথ্যা অপবাদে দায়ের কারাবরণ করেন। তিনি আদ্যাহ প্রদত্ত অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বুপ ক্রমান্বয়ে কারাগারে সকলের প্রশংসার পাত্র হয়ে উঠেন। তিনি স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

একদিন মিসরের বাদশাহ স্বপ্ন দেখেন, ‘সাতটি সুন্দর-সবল গাভিকে সাতটি দুর্বল গাভি খেয়ে ফেলছে। তিনি আরও দেখেন সাতটি সবুজ শস্য শিখ এবং সাতটি শুষ্ক শিখ।’ তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য রাজদরবারে জানী-গুণী ও পণ্ডিতদের ডানেন। কিন্তু কারো ব্যাখ্যা তাঁর পছন্দ হয়নি। বাদশাহ স্বপ্নের পেলেন কারাগারে এক যুবক আছেন, যিনি স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা করতে পারেন। অবশেষে বাদশাহ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চান। স্বপ্নের ব্যাখ্যার হযরত ইউসুফ (আ.) বলেন, ‘দেখে সাত বছর প্রচুর শস্য উৎপন্ন হবে। আর পরবর্তী সাত বছর একটানা তীব্র দুর্ভিক্ষ চলবে।’ সাথে সাথে তিনি দুর্ভিক্ষ হতে পরিদ্রাণ পাওয়ার উপায়ও বলে শিলেন। এ ব্যাখ্যা বাদশাহের অত্যন্ত মনঃপূত হলো। ফলে তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিরুদ্ধে অনীত সকল অভিযোগ তুলে নেন এবং তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন।

মজী পদ লাভ

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যার হুশি হয়ে বাদশাহ তাঁকে অর্থমন্ত্রী পদে নিয়োগ দেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর প্রচুর খাদ্য-শস্য ফলন হয়। পরবর্তী সাত বছরে কম ফলন হওয়ায় মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অতাবের ভাঙলার তাঁর ভ্রাতারা তিনবার খাদ্য-শস্য সংগ্রহের জন্য রাজদরবারে আসে। প্রথমবারেই হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁদের চিনে ফেলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের নিকট নিজের পরিচয় প্রকাশ করেননি। তবে মানবিক কারণে প্রত্যেকবারই তাঁদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য-শস্য বরাদ্দ দেন। দ্বিতীয়বার কৌশলে আপন সহোদর বিন ইয়ামিনকে আটকিয়ে রাখেন। তৃতীয়বার নিজের পরিচয় প্রদান করেন এবং পিতার-পরিবারের লোকজনকে রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানান। তখন ভ্রাতাপণ নিজেদের দ্বুলা বুঝতে পেরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বলে : ‘তারা বলল, আদ্যাহর লপথ! আদ্যাহ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরাতো অপরাধী ছিলাম।’ (সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯১)

হযরত ইউসুফ (আ.) এ বলে তাঁদের ক্ষমা করে দিলেন যে, ‘আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আদ্যাহ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়াশীল।’ (সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯২)

পরবর্তী সময়ে তাইয়েরা তাঁদের বৃদ্ধ পিতাকে সাথে নিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট আগমন করেন। তিনি তাঁদেরকে উচ্চ সংবর্ধনা জানান। এরপর তাঁরা সকলে একসাথে মিলেমিশে বসবাস করতে থাকেন। হযরত ইউসুফ (আ.) ১১০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মতো বিপদাপদে ঐর্বে ধারণ করব। তার মতো চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করব এবং ক্ষমা করতে শিখব।

দশীর কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করবে।

পাঠ - ৩

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনাদর্শ

হযরত মুহাম্মদ (স.) নবুহত প্রান্তির পর মক্কা নগরীতে ইসলামের দাওয়াত নিতে শুরূ করেন। মক্কার পরিবেশ দাওয়াতের অনুকূল না থাকায় তিনি আত্মাহার নির্দেশে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন।

হিজরত ও দেশপ্রেম

হিজরত অর্থ ত্যাগ করা, হিন্দু করা। ইসলামি পরিভাষায় আত্মাহার সত্ব্বিকি লাভ বা ধর্মের নিরাপত্তার জন্য বাসভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করা। সত্য ও ন্যায়ের জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো দেশে গমন করাই হিজরত। হিজরতের আর একটি অর্থ রয়েছে শরিয়তের নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করা। মক্কা নগরীতে ইসলামের কাজ যখন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকল, তখন হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে হত্যা করার জন্য মক্কার কাফিররা সিঁখান্ত নিল। সে অনুযায়ী তারা এক রাতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ঘর অবরোধ করল। আত্মাহার তায়াল্লা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে কাফিরদের এ সিঁখান্তের ও অবরোধের কথা জ্ঞানিয়ে দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর কাছে রাখা আমানতের সম্পদগুলো হযরত আলি (রা.)-কে বুঝিয়ে দিলেন এবং স্বীয় বিছানায় তাঁকে রেখে হযরত আবু বকর (রা.)-কে সঙ্গে করে প্রত্যয়ে কাফিরদের চোখ এড়িয়ে মদিনার দিকে রওয়ানা হলেন। কাফিররা ঘরে প্রবেশ করে মহানবি (স.)-এর বিছানায় হযরত আলি (রা.)-কে দেখে ভীষণ রাগান্বিত হলো। তবে তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আমানতদারী দেখে লজ্জিত হলো। বাকি শত্রু ভেবে হত্যার জন্য তাদের এ প্রচেষ্টা, তিনি এত মহান ও উদার হতে পারেন তা তারা চিন্তাও করেনি। মহানবি (স.) আবু বকর (রা.)-কে নিয়ে সাগর পর্বতের গুহার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এদিকে কাফিররাও তাঁদের খুঁজতে গুহার মুখ পর্যন্ত এসে পড়ল। আবু বকর (রা.) এ অবস্থা দেখে খুব বিচলিত হলেন। তখন হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁকে বললেন, 'ছুমি চিন্তা করো না, আত্মাহার আমাদের সাথে আছে।' (সূরা-আত তাওবা, আয়াত ৪০) পরিশেষে হযরত মুহাম্মদ (স.) ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর মদিনায় পৌঁছলেন। মদিনার সর্বস্তরের লোক তাঁকে সাদরে গ্রহণ করল।

মক্কার কাফিররা যতই নির্ঝাটন করল, হযরত মুহাম্মদ (স.) তাদের সব নির্ঝাটন সহ্য করলেন। তিনি তাঁর সাথীদের বিভিন্ন দেশে হিজরত করালেও শ্রিয় জনবৃদ্ধির মায়া ত্যাগ করে নিজে কোথাও যাননি। অবশেষে আত্মাহার পক্ষ থেকে হিজরতের আদেশ আসল। হযরত মুহাম্মদ (স.) আত্মাহার আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন এবং জনবৃদ্ধির মায়া ত্যাগ করে মদিনায় চলে গেলেন। তিনি জনবৃদ্ধি ছেড়ে যাওয়ার সময় মক্কাতে লক্ষ্য করে বললেন 'আত্মাহার কসম! তুমি আত্মাহার সর্বোত্তম ভূখণ্ড এবং আত্মাহার দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা প্রিয়ভূমি। অমাকে এখান থেকে জোরপূর্ব্বক তড়িয়ে দেওয়া না হলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।' (তিরমিযি)

মদিনা সনদ

হিজরতের পর হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কতগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এগুলোর মধ্যে মদিনার সনদ উল্লেখযোগ্য। এতে তিনি ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রীয় বিতর্ক নিরসন করে পারস্পরিক শান্তি-সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে কতিপয় নীতিমালা তৈরি করেন। যা মদিনা সনদ নামে খ্যাত। এটি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান।

মদিনা সনদের ধারাসমূহ

সনদ মোট ৪৭টি (মতান্তরে ৫০টি) ধারা ছিল। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা উল্লেখ করা হলো-

১. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহকে নিয়ে একটি সাধারণ জাতি গঠিত হবে।
২. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহের কারো ওপর যদি বাইরের শত্রু আক্রমণ করে তবে সকল সম্প্রদায় মিলে শত্রুকে প্রতিহত করতে হবে।
৩. কেউ মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করে কুরাইশদের কোনোরূপ সাহায্য সহযোগিতা করতে পারবে না কিংবা তাদের সাথে কোনোরূপ গোপন চুক্তিও করতে পারবে না।
৪. সকল সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কারো ধর্ম পালনে বাধা সৃষ্টি করবে না।
৫. কেউ যদি কোনোরূপ অপরাধ করে, তবে তার জন্য তাকেই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে। এ জন্য তার সম্প্রদায়কে দোষারোপ করা যাবে না।
৬. অসহায়, দুর্বল, অত্যাচারিতকে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে।
৭. হত্যা, রক্তারক্তি ইত্যাদি কাজকর্ম এমন থেকে নিষিদ্ধ করা হলো।
৮. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হবেন এবং তিনিই পদাধিকার বলে প্রধান বিচারপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

মদিনা সনদের গুরুত্ব

ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। এ সনদের ফলে মদিনার লোকজনের মাঝে সকল হিংসা-বিষেব ও কলহের অবসান হলো। তারা ঐক্যবদ্ধ হলো। ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা হলো। মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে এক উদার সম্প্রীতি স্থাপিত হলো।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ক্ষমতাবৃদ্ধি, বৃদ্ধিমত্তার পরিচয়সহ ইসলাম প্রসারের কাজ আরও বেগবান হলো। নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি গড়ে উঠল রাজনৈতিক ঐক্য এবং গোড়ালন্তন হলো একটি শান্তিময় ইসলামি রাষ্ট্রের।

মদিনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সুশাসন

মদিনা সনদের ফলে মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হলো। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হলো একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ইসলামি রাষ্ট্র। ফলে মুসলমানগণ বিনা বাধ্যতায় সকল ইসলামি বিধিবিধান পালন করার সুযোগ পেল। হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনার সুশাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর সুশাসনের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হলো-

- আইনের কর্তৃত্ব এবং সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করা।
- ধর্ম, বর্ণ গোত্রভেদে সকল নাগরিকের প্রতি সুবিচার করা।
- মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও আত্মতৃপ্তি প্রতিষ্ঠা করা।
- সরকারের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- মজলিসে শুরা বা পরামর্শ পরিষদ গঠন করা।
- ভালা কাজ একে অন্যকে সহযোগিতা করা ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখা ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে মদিনার ইসলামি রাষ্ট্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলো।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দূরদর্শিতা

জন্মভূমিকে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আল্লাহর দর বিয়ারত করার অদম্য ইচ্ছা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মনে জগপ্রত হলো। অবশেষে ৬ষ্ঠ হিজরি মোতাবেক ৬২৮ খ্রিস্টাব্দের যিলকদ মাসে তিনি মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তার সাথে ছিল ১৪০০ (চৌদ্দশত) নিরস্ত্র সাহাবি। তাঁদের কোনো সামরিক উদ্দেশ্য ছিল না। প্রত্যেকের সাথে ছিল মাত্র একটি করে কোষবস্ত্র তরবারি। ভবকালীন আরবে প্রত্যেক লোকের সাথেই এসব থাকত। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর সাথীদের নিয়ে মক্কার ৯ মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছেন। মক্কার কাফিররা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ শুনে বুঝ ভীতসন্ত্রস্ত হলো। তারা মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য সদল বলে অস্ত্রসহ অগ্রসর হলো। হযরত মুহাম্মদ (স.) মুসলমানদের পক্ষ হতে তাঁদের নিকট হযরত উসমানকে দূত হিসেবে পাঠালেন। কাফিরদেরকে বুঝানো হলো যে মুসলমানরা শুধু হজ্জ করে আবার চলে যাবে। হযরত উসমান (রা.) আসতে দেরি হওয়ার মুসলমানদের মাঝে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) সাহাবিদের নিয়ে একটি গাছের নিচে সমবেত হলেন এবং উসমান হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য শপথ নিলেন। শপথ 'বাইয়াতে রিদওয়ান' নামে পরিচিত। মুসলমানদের কঠিন সিন্ধুজ্ঞের কথা জানতে পেরে কাফিররা হযরত উসমানকে মুক্তি দিল। অনেক বাকবিভাগের পর মুসলমান ও কাফিরদের মাঝে চুক্তি হলো। এ চুক্তি 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। এ চুক্তির লেখক ছিলেন হযরত আলি (রা.)। চুক্তিতে অনেকগুলো শর্ত ছিল। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো-

১. ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানগণ হজ্জ সমাপন না করেই মদিনায় প্রত্যাবর্তন করবে।
২. কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে আগামী দশ বছর যেকোনো প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে।
৩. আগামী বছর মুসলমানগণ হজ্জ করতে পারবে। কিন্তু তিন দিনের অধিক সময় মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না। সেই তিন দিন কুরাইশগণ নগর পরিত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করবে।
৪. হজে আগমনকালে মুসলমানগণ আত্মরক্ষার জন্য কেবল কোষবস্ত্র তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবে না।
৫. হজের সময় মুসলমানদের জ্ঞানমাল নিরাপদ থাকবে।
৬. মক্কার বণিকগণ মদিনার পথ দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদে সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশের সন্ধ্যা ব্যবসার-বাণিজ্য করতে পারবে।
৭. সন্ধির শর্তাবলি উভয় পক্ষকে পুরোপুরিভাবে পালন করতে হবে।

সন্ধির চুক্তিপত্রো বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের বিপক্ষে মনে হলো। তবে বাস্তবে সব শর্তই মুসলমানদের অনুকূল ছিল। সন্ধির ফলে পরবর্তীতে বিনা বাধার মক্কা বিজয়সহ মুসলমানদের অনেক অগ্রগতি হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ফুটে উঠল।

বর্তমান মুসলিম জাতির উচিত মদিনা সনদ ও হুদায়বিয়ার সন্ধি হতে শিক্ষা গ্রহণ করা। এর ফলে মুসলিম বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বসে আলোচনা করে মদিনা সনদের আটটি ধারার একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টারে লিখবে।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থীরা হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টারে লিখবে।

পাঠ - ৪

হযরত উসমান (রা.)

পরিচয়

হযরত উসমান (রা.) ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আফফান, মাতার নাম ছিল ওরওয়াহ। ইসলামের চার খলিফার মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় খলিফা। বালাকাল থেকেই তিনি সন্ত, ভদ্র, লজ্জাশীল ও বিনয়ী ছিলেন। তাঁর চরিত্রে মুশ্ব হয়ে রাসূল (স.) তাঁর প্রথম কন্যা হুকাইয়াকে তাঁর নিকট বিবাহ দেন। হুকাইয়া মারা গেলে অতঃপর উম্মে কুলসুমকে তাঁর কাছে বিবাহ দেন। ফলে তাঁকে 'মুনুরাইন' (দুই নুরের অধিকারী) বলা হতো। তিনি ব্যবসা করতেন বিধায় তাঁর অনেক সম্পদ ছিল। তাই তাঁকে 'গনি' (ধনী) বলা হত। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণে তাঁর চাচা হাকাম তাঁকে অনেক নির্যাতন করে। তাঁর নিকটাত্মীয়রাও নির্যাতনের যাত্রা বাড়িয়ে দিলে তিনি তাঁর স্ত্রী হুকাইয়াসহ আবিসিনিয়ার হিজরত করেন।

ইসলামের সেবা

হযরত উসমান (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর সর্বদা ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সর্বদা রাসূল (স.)-এর সাথে থাকতেন। এ কাজে তিনি তার সম্পদ উদার হাতে ব্যয় করেন। তিনি নিজ খরচে মসজিদে নববি সম্প্রসারণ করেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে দুশ্বাসদের মাঝে শাদ্য বিতরণ করেন। তাবুক যুদ্ধে তিনি দশ হাজার নিনার (হুদ্রা) ও এক হাজার উষ্ট্র মুসলিম সেনাবাহিনীকে দান করেন।

শিলাফত লাভ ও কুরআন সংকলন

হযরত উসমান (রা.) ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে খলিফা নির্বাচিত হলেন। অতঃপর তিনি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদনের পাশাপাশি পবিত্র কুরআন সংকলনে হাত দেন। মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলে বিভিন্ন এলাকার লোকজন পবিত্র কুরআন বিভিন্নভাবে তিলাওয়াত করতে লাগল। ফলে মুসলমানদের মধ্যে অনেকাংশে দেখা গেল। তিনি এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। রাষ্ট্রীয় নির্দেশ জারি করে তখনকার সময়ে বিদ্যমান পবিত্র কুরআনের সকল কপি সংগ্রহ করলেন। হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত পবিত্র কুরআনের মূল কপিটি সংগ্রহ করার মাধ্যমে কুরআন সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেন। অতঃপর মুসলিম জাহাঙ্গীরের গভর্নরদের নিকট একটি করে কপি পাঠান। অবশিষ্ট সংগৃহীত কপিগুলো আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। পবিত্র কুরআনকে মূল ভাষা অনুযায়ী সংকলন করার ফলে তাঁকে 'জামেউল কুরআন' (কুরআন সংকলক) বলা হয়।

হযরত উসমান (রা.) দীর্ঘ ১২ বছর শিলাফতে দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে ৮৩ বছর বয়সে কতিপয় বিশ্রোহী হাতে শাহাদত বরণ করেন। তাঁর ব্যাপারে রাসূল (স.) বলেছেন- 'প্রত্যেক নবিরই একজন বান্দু রয়েছে, জান্নাতে আমার বান্দু হবেন উসমান।'

হযরত উসমানের রাষ্ট্র পরিচালনা

হযরত উসমান (রা.) ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর আমলে ইসলামী শিলাফত ব্যাপক বিস্তৃত হয়। পশ্চিমে মরক্কো, পূর্বে বর্তমান পাকিস্তানের দক্ষিণ পূর্ব এবং উত্তরে আরমেনিয়া ও আজারবাইজান পর্যন্ত তা বিস্তার লাভ করে। তাঁর সময়ে সর্ব প্রথম মুসলিম নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রশাসনিক বিভাগসমূহ সম্প্রসারিত হয় এবং কল্যাণমূলক বহু কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।

তিনি অনেকগুলো অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পাদন করেন, যাতে করে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত হয়। তিনি হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক প্রবর্তিত ভাতা প্রায় ২৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। তাঁর সময়ে ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করেন, বাজার পরিদর্শক কর্মকর্তা নিয়োগ করেন, কৃষি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রশাসক নিয়োগ করেন।

খলিফা হিসেবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে তিনি নিজের জন্য কোন বেতন-ভাতা গ্রহণ করতেন না। তাঁর প্রথম ও বহুরের শাসন আমল শান্তিপূর্ণ ছিল এবং খোলাফায়ে রাশেদুনের মধ্যে তিনি সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিলেন।

দলীয় কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে হযরত উসমান সম্পর্কে লেখাতি পাঠ করে শ্রেণিতে

দলগতভাবে আলোচনা করবে।

বাড়ির কাজ : ইসলামের কল্যাণে হযরত উসমান (রা.) এর অবদানসমূহ উল্লেখ কর।

পাঠ - ৫

হযরত আলি (রা.)

পরিচয়

হযরত আলি (রা.) ছিলেন রাসূল (স.)-এর চাচাতো ভাই। তিনি ৬০০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবু তালিব, মাতার নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ। তিনি ছোটদের মধ্যে প্রথম মুসলমান। তিনি ১০ বছর বয়সে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ‘আশারা-ই-মুবাশ্শারার’ (জন্মভূমির সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবি)-এর একজন এবং ইসলামের চতুর্থ খলিফা। ছোটকাল থেকেই জ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। তাই তিনি সর্বদা রাসূল (স.)-এর সাথে সাথে থাকতেন। রাসূল (স.)-এর প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল অসীম। রাসূল (স.) তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর অতি আদরের কন্যা ফাতিমাকে হযরত আলি (রা.)-এর সাথে বিবাহ দেন। হযরত আলি (রা.) খুব নির্ভিক ও সাহসী ছিলেন। রাসূল (স.) হিজরতের সময় তাঁকে তাঁর বিছানায় রেখে যান। রাসূল (স.)-এর কাছে আমানত রাখা সম্পদ মূল মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। এতে তাঁর জীবনের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এরপরও তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

বীরত্ব ও জ্ঞানসাধনা

হযরত আলি (রা.) ছিলেন একজন অসাধারণ বীরযোদ্ধা। তাঁর বীরত্বের কারণে বদরের যুদ্ধে ‘জুলফিকার’ নামক তরবারি উপহার পান। আর খায়বার যুদ্ধে ‘কামুল’ দুর্গ বিজয়ের পর রাসূল (স.) তাঁকে ‘আসাদুদ্দাহ’ (আগ্রাহর সিংহ) উপাধি দেন। তিনি হুদায়বিয়ার শনিধর লেখক ছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহনকারী ছিলেন।

জ্ঞান সাধক হযরত আলি (রা.) ছিলেন জ্ঞানপিপাসুদের এক অনন্য দূত। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁর জ্ঞানচর্চা অব্যাহত ছিল। কুরআনের তাফসির, হাদিসের বিশ্লেষণ এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। আরবি ভাষার ব্যাকরণ রচনায় তাঁর প্রধান ভূমিকা ছিল। তাঁর জ্ঞানের ব্যাপারে মহানবি (স.) বলেছেন, “আমি জ্ঞানের শহর, আর আলি (রা.) তার দরজা”। (মুস্তাদরাক হাকিম) হযরত আলি (রা.) এর রচিত ‘দেওয়ানে আলি’ (আলির কাব্য সংকলন) আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তিনি তাঁর শাসনামলে মসজিদে জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা করেন।

খলিফা নির্বাচন

৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে হযরত উসমান (রা.) শাহাদত বরণ করেন। এরপর মুসলমানদের মতামতের ভিত্তিতে হযরত আলি (রা.) মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি অনেক সময়ের মুশোমুখি হন। অসাধারণ মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে দৃঢ়তার সাথে এগুলো সমাধা করেন।

হযরত আলি (রা.) এর রাষ্ট্র পরিচালনা:

তখন মুসলমানগণ চরম উপদলীয় ভোলালে লিপ্ত হওয়ায় ইসলামের ইতিহাসের চরম সংকটকাল চলছিল। তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি রাজনৈতিক জোট (Coalition) গঠন করেন এবং প্রশাসনে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি (Nepotism) সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেন। তিনি অভিজাত ভূমি মালিকদের নিকট থেকে ভূমি পুনরুদ্ধার করেন এবং আদায়কৃত কর ও মুদলক সম্পদ মুসলিম নাগরিকগণের মধ্যে সমভাবে বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যেহেতু তখন প্রায় সকল মুসলমানই বেদুঈন ও কৃষক ছিলেন সে কারণে তিনি ভূমি ও কৃষি উন্নয়নের বিষয়ে বেশী আগ্রহী ছিলেন।

হযরত আলি (রা.) এর প্রশাসনিক আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে মিসরের গভর্নর মালিক আল-আশতারের কাছে প্রেরিত নির্দেশনামূলক একটি চিঠিতে, তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, “ভূমি তোমার প্রজাদের জন্য তোমার অন্তর্করণে কমা, ভালবাসা ও দয়া প্রবর্তিত কর। তাদেরকে সহজে শিকারযোগ্য মনে করে তাদের সমুদ্রে পেটুক জন্তর মতো হওয়া না। কেননা তারা দু’ধরনের: হয়তো তারা তোমার ধর্মীয় ভাই নয়তো তারা সৃষ্টিগতভাবে তোমার সমান। তারা অসতর্কভাবে ভুল করতে পারে, তাদের অদক্ষতা থাকতে পারে, তাদের ঘারা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুলবশত: (মন্দকাজ) সংঘটিত হতে পারে। সুতরাং তাদেরকে সেভাবেই কমা কর যেভাবে ভূমি আগ্রাহর কাছে তাঁর কমা প্রত্যাশা কর। কেননা, ভূমি তাদের উপরে এবং যে তোমাকে নিযুক্ত করেছে সে তোমার উপরে, আর আল্লাহ তার উপরে যে তোমাকে নিযুক্ত করেছে।

ভূমি তাদের (প্রজাদের) চাহিদাগুলো পূরণ করবে আল্লাহ তাই প্রত্যাশা করেন এবং তিনি তাদের ঘারা তোমাকে পরীক্ষা করছেন।”

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত নির্দেশনাকে ইতিহাসে ইসলামি শাসনের আদর্শ সংবিধান (Ideal Constitution of Islamic Governance) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

জীবনযাপন

হযরত আলি (রা.) ছিলেন সহজ-সরল ও আত্মত্যাগের সুমহান আদর্শ। ছোটকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। নিজের খাদ্য নিজেই যোগাড় করতেন। কখনো কখনো অনাহারে থাকতেন। তিনি নিজের কাজ নিজেই করতেন। জীর্ণ কুঠিতে বসবাস করতেন। ধনী-দরিদ্র সকলের সাথে মিলেমিশে চলতেন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরও এসব গুণাবলি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

তিনি প্রায় ৬ বছর বিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ইবনে মুলজাম নামক এক পথহরষ্ট খারোজির হাতে শাহাদাত বরণ করেন। তখন তিনি নামাযরত অবস্থায় ছিলেন। রাসূল (স.) তাঁর ব্যাপারে বলেছেন- ‘সে [আলি (রা.)] প্রত্যেক মুমিনের বন্ধু।’ (তিরমিধি)

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থীরা জ্ঞানসাধনায় হযরত আলি (রা.)-এর অবদান সম্পর্কে

১০টি বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পড়লেন। পুনরায় মহানবি (স.) তাঁকে কাছে ডেকে কী খেন বললেন, তাতে তিনি হাসতে লাগলেন। হযরত আয়েশা (রা.) তাকে হাসি-কান্নার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আকাজান প্রথমে আমাকে জানিয়েছেন 'মা আমার আর সময় নেই, আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাব'। আর দ্বিতীয়বার আমাকে জানিয়েছেন, 'পরিবারের সকলের মধ্যে আমিই তাঁর [মুহাম্মদ (স.)] সাথে প্রথমে মিলিত হব।' হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইত্তিকালের পর তাঁর জীবনে শোকের ছায়া নেমে আসে। এরপর তিনি যত দিন বেঁচে ছিলেন কখনো মুচকি হাসি হাসেননি।

স্বভাব চরিত্র

হযরত ফাতিমা (রা.) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সকল গুণই অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, লজ্জাশীল, পরোপকারিণী, ধৈর্যশীল ও আত্মাহর ওপর অধিক আস্থাশীল। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন- 'ফাতিমা আমার দেহের এক অংশ, যে তাঁকে নারাজ করবে, সে আমাকে নারাজ করবে।' (সহিহ বুখারি)

তিনি আরও বলেন, 'ফাতিমা হলেন জান্নাতবাসী মহিলাদের নেত্রী।' (সহিহ বুখারি) হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- 'আমি ফাতিমার তুলনায় সশটভাষী ও সত্যবাদী কাউকে দেখিনি। তবে তাঁর পিতার কথা স্বতন্ত্র।' (আল-ইস্টি'যাব)

সন্তান সন্ততি

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর গর্ভে ৫ জন সন্তান জন্ম লাভ করেন। তারা হলেন হযরত হাসান (রা.), হযরত হুসাইন (রা.), হযরত মুহসিন (রা.), হযরত উম্মে কুলছুম (রা.) ও হযরত যরনব (রা.)। হযরত মুহসিন (রা.) বাল্যকালে মৃত্যুবরণ করেন।

ইত্তিকাল

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইত্তেকালের পর হযরত ফাতিমা (রা.) ছয় মাস জীবিত ছিলেন। এগার হিজরির তৃতীয় রমযান মজালবার তিনি ইত্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৯ বছর। হযরত ফাতিমা (রা.)-কে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়। সুন্দর চরিত্র, পিতৃভক্তি, অকুরিম স্বামী সেবা, দানশীলতা ও লজ্জাশীলতা হযরত ফাতিমা (রা.)-কে বিশ্ব নারী জাতির ইতিহাসে মহীয়সী করে রেখেছে।

দলীয় কাজ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর চরিত্রিক গুণাবলীর তালিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

সুনস্থান পূরণ কর

- ১। হযরত ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি করার নির্দেশ ছিল একটি _____।
- ২। ইসলামের ইতিহাসে মদিনার সনদের গুরুত্ব _____।
- ৩। হযরত আলি (রা.) ছিলেন একজন _____ বীর যোদ্ধা।
- ৪। হযরত ফাতিমা (রা.) _____ ব্যাপারে ছিলেন খুবই উদার।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. হযরত ইসমাইল (আ.)	সর্বোত্তম কাহিনী
২. হযরত ইউসুফ (আ.) –এর কাহিনী	আব্বাহর নবি ও রাসূল
৩. হযরত মুহাম্মদ (স.)	একটি শান্তি চুক্তি
৪. মদিনার সনদ	আব্বাহর নবি
৫. হুদায়বিয়ার সন্ধি	গৃধিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সন্ধি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত ইসমাইলের বংশপরিচয় লিখ।
২. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দেশপ্রেম সম্পর্কে লিখ।
৩. মদিনা সনদ কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনী লিখ।
২. হযরত উসমান (রা.)-কে ছিলেন? ইসলামের কল্যাণে তার অবদানসমূহ লিখ।

৩. হযরত আলি (রা.) এর বীরত্ব ও জ্ঞানসাধনার একটি বর্ণনা দাও।

৪. হযরত যসতিমা (রা.)-এর পরিচয়, জীবনযাপন ও দানশীলতা সম্পর্কে যা জানা লিখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর ভাইয়ের নাম কী?

ক. ইসমাইল (আ.) খ. বিন ইয়ামিন (আ.)

গ. খালিদ বিন ওয়ালিদ (র) ঘ. ইউনুছ (আ.)।

২. হযরত ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানির জন্য আহ্বাহর নির্দেশ ছিল -

i. পিতা ইব্রাহীম (আ.)-এর আনুগত্য পরীক্ষা

ii. পুত্র ইসমাইল (আ.)-এর আনুগত্য পরীক্ষা

iii. কুরবানি ওয়াজিব করার জন্য

কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

প্রবাসী জালাল মিয়া উদার হস্তে দান করেন এবং এলাকায় কয়েকটি মসজিদ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এতে এলাকার মোড়ল তার গুণের ফিল্পিত হয়ে একদল দুষ্কৃতিকারী লেগিয়ে দেয় এবং তারা তাকে অপমানিত করে। তারপরেও জালাল মিয়া নিরুৎসাহিত না হয়ে তার জনকল্যাণমূলক কাজ অব্যাহত রাখেন।

৩. জালাল মিয়ার কাজে মূলত কোন খলিফার চরিত্র ফুটে উঠেছে?

ক. হযরত আবু বকর (রা.)-এর খ. হযরত উমর (রা.)-এর

গ. হযরত উসমান (রা.)-এর ঘ. হযরত আলি (রা.)-এর।

৪. জালাল মিয়ার কাজের ফলে -

i. আহ্বাহ খুশী হন

ii. সমাজ উপকৃত হয়

iii. নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়

স্বজনশীল প্রশ্ন

- ১। পলাশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিষদের নির্বাচনে পাশাপাশি অবস্থিত দুই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদের সৃষ্টি হয়। বিবাদের চরম পর্যায়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের সেলিম মিয়র মধ্যস্থতার উভয় গ্রামের কয়েকজন প্রতিনিধিকে নিয়ে অলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে একটি সমঝোতা চুক্তি করা হয়। এতে উভয় গ্রামের মানুষ নিশ্চিত সংঘর্ষ থেকে মুক্তি পায়। শেষে সেলিম মিয়র সবার উদ্দেশ্যে বলেন, শান্তি-স্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠায় সবার মহানবি (স.) প্রবর্তিত সনদের অনুসরণ আবশ্যিক।

ক. হিজরত শব্দের অর্থ কী?

খ. মহানবি (স.) মদিনায় হিজরত করলেন কেন?

গ. উদ্দীপকে সমঝোতা চুক্তিটি মহানবি (স.)-এর কোন চুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর—

ঘ. স্থানীয় সেলিম মিয়র শেষ উক্তিটি দ্বারা রাসূল (স.) প্রবর্তিত যে সনদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তার বিশ্লেষণ কর।

২. প্রাচুর্য আর ধন-সম্পদ ধনাঢ্য জাহিদ সাহেবকে অহংকারী করে নি, বরং তিনি খাঁটি মুমিন। মুমিন হওয়ার কারণে গ্রামের অন্যান্য লোকজন তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। তারপরও গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি খাদ্য বিতরণ করে সবাইকে সাহায্য করেন। গ্রামে কুরআন তিলাওয়াতকে কেন্দ্র করে অনেক দেখা দিলে সবাইকে একাবন্ধ রাখার প্রয়াস চালান।

ক. ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম কী?

খ. ইসলামের তৃতীয় খলিফাকে কেন গণি বলা হতো?

গ. জাহিদ সাহেবের অচরণে তৃতীয় খলিফার যে চারিত্রিক গুণের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. গ্রামবাসীকে একাবন্ধ রাখতে জাহিদ সাহেবের প্রচেষ্টা তৃতীয় খলিফার কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত—বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত